New Bangla Pdf Download-
Our facebook- www.facebook.com/PoragEducation

চমক হাসান

অঙ্ক ভাইয়া

চমক হাসান

অঙ্ক ভাইয়া

টেনশন টিনা, যে তুচ্ছ কারণে দুশ্চিন্তা করতে করতে হতাশায় ডুবে যায়
বিটলা বান্টি, দুষ্টুমির আড়ালে যার প্রশ্নগুলো চিন্তার খোরাক জোগায়
তুখোড় তন্বী, যে পারদর্শী নানামুখী দক্ষতায়
আর অবাক পৃথ্বী, জগতের সবকিছুতে যে বিস্ময় খুঁজে পায়
—ওরা সবাই আজ অসহায় নজিবুল্লাহ মাস্টারের দাপটে।
ওদের মনে গণিত নিয়ে হাজারো প্রশ্ন, উত্তর মেলে না কিছুতেই!

ওরা তখন আশ্রয় খোঁজে অঙ্ক ভাইয়ার কাছে।

কোত্থেকে এল, কোথায় কাজে লাগে, এটা এমন কেন, অমন নয় কেন, এটা শিখে কী হয়, ওটার মূল ঘটনাটা কী— এমন সব প্রশ্নের উত্তর 'অঙ্ক ভাইয়া' দিয়ে যান পরম মমতায়।

বাংলাদেশের আয়তন নাকি ক্ষেত্রফল, পেঁয়াজ কুচি পদ্ধতিতে গোলকের আয়তন, পিথাগোরাস দিয়ে আইনস্টাইন, ফাংশনের বৃত্তান্ত, পৃথিবীর সুন্দরতম সমীকরণ, ঋণাত্মক সংখ্যার লসাগু-গসাগু, গিটারের গণিত, হাতে-কলমে ঘনমূল, সাইন কসের নামরহস্য, লগের ভেতরের কথা, অসমতার চিহ্ন— এমন চিন্তাগুলো যদি আপনার মনে কৌতূহল জাগায়— বইটি আপনার জন্য!

ISBN: 978-984-9266-42-6

www.adarshapublications.com

অঙ্ক ভাইয়া

চমক হাসান

আদর্শ

প্রকাশক : আদর্শ
প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র : আদর্শ বই
কনকর্ড অ্যাম্পোরিয়াম, কাঁটাবন, ঢাকা ১২০৫
☎+০২-৯৬১২৮৭৭, ০১৭১০৭৭৯০৫০
Email: info@ adarshapublications.com
Website: www.adarshapublications.com

অঙ্ক ভাইয়া

২য় সংস্করণ, ২য় মুদ্রণ : ১১ অগ্রহায়ণ ১৪২৫, ২৫ নভেম্বর ২০১৮
২য় সংস্করণ : ২০ আষাঢ় ১৪২৫, ৪ জুলাই ২০১৮
১ম প্রকাশ : ১৯ মাঘ ১৪২৪, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

© লেখক

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটি আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ

প্রচ্ছদ : সাজু
মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা : আদর্শ প্রিন্টার্স
প্রধান পরিবেশক : আদর্শ বই
মূল্য : বাংলাদেশে ৩০০ টাকা

Anko Bhaiya (*Published in Bengali)*
by *Chamok Hasan*
Published by Adarsha
Concord Emporium, Kataban, Dhaka 1205

ISBN: 978-984-9266-42-6

উৎসর্গ

আমার কন্যা 'বিনীতা বর্ণমালা'কে।

মা, চোখভর্তি প্রশ্ন নিয়ে সহজ একজন মানুষ হয়ে বড় হ। উত্তর পাওয়ার আগ পর্যন্ত নষ্ট হতে দিবি না একটা প্রশ্নকেও। আর যদি উত্তর পেয়ে যাস, খুঁজে বের করবি আরও আরও প্রশ্ন। প্রশ্নই পথ দেখাবে ভবিষ্যতের! আর যখন ভবিষ্যতের পথে হাঁটবি, মনে রাখিস— মেধা, প্রতিভা, কর্মদক্ষতার থেকেও বহু দামি হলো অন্যের জন্য মমতা, অন্যের থেকে পাওয়া ভালোবাসা। স্বার্থহীন চেষ্টায় অর্জন করে নিস সেই ভালোবাসা।

বাবার দোয়া রইবে সব সময়!

এবং আমার কন্যার মা 'ফিরোজা বহ্নি'কে...

তোমায় প্রিয় সংখ্যা ৫। একদিন কথায় কথায় আমায় বলেছিলে, 'আমি ৫ আর তুমি হচ্ছ ২৫।' আমি জানতে চাইলাম, 'কেন, আমি ২৫ কেন?'। তুমি বলেছিলে, 'তুমি আমার বর-গো'! এর চেয়ে প্রেমময়, এর চেয়ে মন খুশি করা গাণিতিক উক্তি আমি আর কোনো দিন শুনিনি!

আমার মেয়েটা তোমার মতো হোক, যেখানেই যাক

তার চারপাশটা ভরিয়ে রাখুক আনন্দে।

পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাণচঞ্চল মানুষ হওয়ার দীক্ষা

ও যেন তোমার থেকে পায়।

ভূমিকা

আমি মনে করি, গণিতের নানা অনুশীলনী আর সমস্যা সমাধানের কৌশল শেখানোর পাশাপাশি একজন গণিতশিক্ষকের একটা বিরাট দায়িত্ব হলো ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং তাদের কৌতূহলকে জাগ্রত রাখা। কেউ যদি নিজের মতো করে গণিত সমাধান করতে চায়, সেটাকে নিবৃত্ত না করে বরং উৎসাহ দেওয়া। এই কাজগুলো অনেকেই করেন না। *এইটা জেনে কী হবে, তুই কি বেশি বুঝিস, আগের ক্লাসের ওইটা পারিস যে এইটা জানতে চাস, সাহস কত যে উপপাদ্য নিজের ভাষায় লিখিস, আমি যেভাবে অঙ্ক করিয়েছি ওইভাবেই করবি*, এমন অযৌক্তিক বাক্যগুলো এখনো শোনা যায় প্রায়ই। এতে গণিত হয়ে ওঠে দুর্বোধ্য আর ভীতিকর। অথচ গণিত কী অপার আনন্দের একটা বিষয়! কত দারুণ সব চিন্তা আছে এর নানান শাখায়।

আমি জানি, গণিত নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের অনেক প্রশ্ন। ‘কেন এমন হয়’, ‘কেন অমন হলো না’, ‘এটা কোত্থেকে এল’, ‘ওটা জেনে লাভ কী’—এমন দারুণ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে নিজেরই জানা হয়ে যায় অনেক কিছু। কিছু প্রশ্ন তো রীতিমতো চ্যালেঞ্জিংও। এই প্রশ্নগুলো যখন আমরা মেরে ফেলি, আমরা হয়তো ধ্বংস করে দিই ভবিষ্যতের একজন শ্রেষ্ঠ গণিতবিদকে। ভবিষ্যতের যে হতে পারত বিজ্ঞানের মহিরুহ, তার বীজ হয়তো আমরা শেষ করে দিচ্ছি অঙ্কুরেই। এটা অন্যায়। ছোট্ট একটা প্রশ্ন কিংবা আপাততুচ্ছ একটা ভাবনাকেও হারিয়ে যেতে দিতে নেই। কারণ সেখান থেকেই একসময় জন্মাতে পারে গণিতের গভীর বিষয়গুলোর প্রতি আগ্রহ, ভালোবাসা।

গণিত নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নগুলো কেমন— এটা জানতে চেয়েছিলাম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে (www.facebook.com/chamok.hasan) আমার বন্ধু, ভক্ত, শুভানুধ্যায়ীদের কাছে। সেখানে চমৎকার সব প্রশ্ন এসেছে। চেষ্টা করেছি সাধ্যমতো অনেকগুলোর উত্তর দিতে। সেই উত্তরগুলোকে সংকলন করে রাখার অভিপ্রায় থেকে এই বইয়ের শুরু। যাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি, তাদের নাম এই বইয়ের শেষে কৃতজ্ঞতায় উল্লেখ করেছি। আরও বহু মানুষের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। আমার সহমানুষ বহ্নিই নাম দিয়েছে অনেকগুলো চরিত্রের, তাদের চরিত্র কেমন হবে সেটার বেশ কিছু ধারণা ওর দেওয়া। ধন্যবাদ জানাই ঝংকার মাহবুব ভাইয়াকে, তার নিঃস্বার্থ সহযোগিতার জন্য। দ্রুত প্রচ্ছদ করে দিয়েছেন গুণী শিল্পী সাজু ভাই, কৃতজ্ঞতা তাকেও। গণিত অলিম্পিয়াডে কাজ করার সময় যারা সহকর্মী এবং নির্দেশক ছিলেন তাদের কথা আমার লেখা সমস্ত গণিত বইয়ে স্মরণ করব। শ্রদ্ধেয় মুনির হাসান, মুহম্মদ জাফর ইকবাল স্যার, মোহাম্মদ কায়কোবাদ স্যার, সুব্রত দেবনাথ, অভীক রায়, সৌমিত্র চক্রবর্তী, তামিম শাহরিয়ার সুবীন ভাই, মাহমুদুল হাসান সোহাগ ভাই— এদের প্রত্যেকের থেকে আমি অনেক শিখেছি। গণিতের ভালোবাসাকে সারা বাংলায় ছড়িয়ে দিতে ওনাদের অবদান অনেক, ওনাদের সান্নিধ্য পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করি। ধন্যবাদ আদর্শকে খুব অল্প সময়ের নোটিশে বইটা প্রকাশ করে দেওয়ার জন্য। সময়ের সঙ্কীর্ণতায় অনেক ভুলভ্রান্তি রয়ে যেতে পারে বইয়ে। সাধ্যমতো চেষ্টা করব পরবর্তী মুদ্রণে ঠিক করে নেওয়ার জন্য।

এই বইটা পড়া যাবে দুইভাবে। একটা ধারাবাহিক গল্প বলা হয়েছে কয়েকটা চরিত্রের বর্ণনায়— স্কুলের এক কঠিন মাস্টার, সেই স্কুলে পড়া চারজন শিক্ষার্থী আর বুয়েটপড়ুয়া একটা ছেলে যার গণিতের প্রতি অসীম ভালোবাসা। গল্প আকারে না পড়ে কেউ যদি সরাসরি প্রশ্নের উত্তর আকারে পড়তে চায়, সেটাও সম্ভব। তার জন্য বইয়ের শেষে পৃষ্ঠা নম্বরসহ একটা বিষয়-তালিকা দেওয়া আছে। কেউ চাইলে সেটা দেখে প্রশ্নের উত্তর আকারেও পড়তে পারবে।

সবশেষে ক্ষমাপ্রার্থনা ও শ্রদ্ধা নিবেদন! এই বইয়ে একজন গণিতশিক্ষককে উপস্থাপন করা হয়েছে নিষ্ঠুরভাবে, যিনি বাচ্চাদের ভয় দেখান, উত্তর দেন না কোনো প্রশ্নের। গল্পের খাতিরে চরিত্রটাকে অতিরঞ্জন করা হয়েছে কিছুটা। আমি জানি এমন শিক্ষক বিরল নন। কিন্তু আমি স্পষ্ট করেই বলতে চাই, গণিত অলিম্পিয়াডে কাজ করার সুবাদে এমন অনেক শিক্ষক আমি দেখেছি, যারা স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে গেছেন নিজের সবটুকু সাধ্য নিয়ে। আমি দেখেছি, কী করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষকেরা নিজ নিজ স্কুলের বাচ্চাদের নিয়ে আয়োজন করছেন গণিত অলিম্পিয়াড। আমি দেখেছি, স্কুলের সময়ের বাইরে নিজের সময় বিলিয়ে শিক্ষকেরা তৈরি করছেন শেখানোর নানান বিষয়বস্তু। আমি সান্নিধ্য পেয়েছি এমন সব শিক্ষকের, যারা তাদের ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিজের জীবনের সব সুখ-আহ্লাদ উপেক্ষা করেছেন অবলীলায়। সেই বীরদের জন্য, সেই কারিগরদের জন্য আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। আপনারা এই বইয়ের নজিবুল্লাহ মাস্টার নন।

চমক হাসান
ভ্যালেন্সিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র
১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

সূচি

ভূমিকা ৯
ভয়ের ভাবনাই ভয়ংকর ১৩
প্রশ্ন চলুক নির্ভয়ে ২১
সংখ্যা নিয়ে সংশয় ৩২
বীজগণিতের বিচিত্র চিন্তা ৫৭
ফাংশন নিয়ে টেনশন ৭৭
জ্যামিতির জমজমাট জল্পনা ৯৫
সুরের মায়ায় বাঁধা যখন গণিত ১১৫
ত্রিকোণমিতির কিছু কথা ১২৬
মুখোমুখি অঙ্ক ভাইয়া আর নজিবুল্লাহ মাস্টার ১৩৬

পরিশিষ্ট ১ ১৪৩
বিষয়-তালিকা ১৫৩

অধ্যায় ১

ভয়ের ভাবনাই ভয়ংকর

১.১

ছায়ামূর্তির মতো হেঁটে আসছিলেন মানুষটি, ধীরে ধীরে, তিনতলার করিডর ধরে। হাতে দুটো বই, একটা চকের বাক্স, একটা ডাস্টার, আর কালো রঙের একটা পাকানো বেত। একেকটা ক্লাসরুমের সামনে দিয়ে হেঁটে আসেন আর ক্লাসরুমগুলোর স্বাভাবিক হইচই হঠাৎ থেমে যায়, কবরস্থানের মতো সুনসান নীরব হয়ে যায়। মাঝে মাঝে দুয়েকজন ছাত্রের ভয় পাওয়া গলার ফিসফিস আওয়াজ শোনা যায়, 'চুপ থাক সবাই, নজিবুল্লাহ স্যার যায়।' শুনে নজিবুল্লাহ সাহেবের চেহারায় কোনো ভাবান্তর হয় না, তিনি নীরবে হেঁটে যান! হেঁটে হেঁটে করিডরের শেষ মাথায় দশম শ্রেণি 'খ' শাখার ক্লাসে গিয়ে ঢোকেন। ঢুকেই দরজাটা ঠাস করে বন্ধ করে দেন। টেবিলে বই, চক-ডাস্টার রাখেন, তারপর বেতটা হাতে নিয়ে টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ান। ক্লাসের দিকে ঠান্ডা দৃষ্টিতে তাকান। মেয়েরা বসেছে বাম দিকের বেঞ্চগুলোতে, ছেলেরা ডান দিকে।

সবাই জানে, আজ কোনো একটা মেয়ের কপালে দুঃখ আছে। স্যার সবার সম-অধিকারে বিশ্বাসী। গতকাল স্যারের প্রচণ্ড ঝাড়ি খেয়ে প্রায় সংজ্ঞা হারিয়েছিল একটা ছেলে। ছেলেটার বিশেষ দোষ ছিল না। স্যার পড়াচ্ছিলেন পিথাগোরাসের উপপাদ্য। সে মুখ ফসকে জিজ্ঞেস করে ফেলেছিল, স্যার, এটা কোথায় কাজে লাগে। আর যায় কোথায়— সে নিজেকে কী মনে করে, কোন সাহসে সে পড়ালেখা বাদ দিয়ে অদরকারি

প্রশ্ন করে, সে আগের ক্লাসের কিছু বোঝে কি না, এসব বলার পর আরও স্পষ্ট করে স্যার তাকে বুঝিয়ে দিলেন, ছাত্রদের কাজ প্রশ্ন করা না, প্রশ্ন করবে স্যারেরা, আর ছাত্ররা লিখবে উত্তর!

সে যা-ই হোক, গতকাল যেহেতু একটা ছেলেকে ঝাড়ি দিয়েছেন, সবাই প্রায় নিশ্চিত যে আজকে ঝাড়ি দেবেন কোনো একটা মেয়েকে। স্যারের নীতি এবং সমতাবোধে কোনো ভুল নাই। নজিবুল্লাহ স্যার মেয়েদের সবার দিকে একবার নজর বুলিয়ে লটারির মতো করে একজনকে বেছে নিলেন, ঠান্ডা-গম্ভীর গলায় হাঁক দিলেন, 'অ্যা-ই, তুই দাঁড়া।' যাকে বললেন, সে দাঁড়াল না। তার পেছনের দুই সারির দুজন ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কিঞ্চিত বিরক্ত হয়ে স্যার বললেন, 'তোরা বস, এই যে লাল ব্যাগ, তুই দাঁড়া। কী হলো, কথা কানে যায় না?' টিনা আশপাশে তাকিয়ে দেখে শুধু তার ব্যাগটাই লাল। তার আশঙ্কাই সত্যি, আজ তার পালা। 'আর যদি জীবনে লাল ব্যাগ কিনেছি!' ভাবতে ভাবতে আর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে উঠে দাঁড়াল...।

১.২

টিনা যখন জর্জরিত নজিবুল্লাহ স্যারের প্রশ্নবাণে— মনে করতে পারছে না ছোট ক্লাসের জিনিসপত্রও; টিনা যখন ভেঙে পড়ছে স্যারের অকথ্য তিরস্কারে, প্রকৌশলী হওয়ার স্বপ্ন ভুলে নিজেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে আদর্শ একজন কাজের বুয়া হিসেবে; টিনা যখন ফরিয়াদ করছে, 'ও আল্লাহ গো, তুমি এই পৃথিবীতে অঙ্কের মতো ভয়াবহ ব্যাপারটা কেন দিলা, কী দরকার ছিল, আর দিলা তো দিলা নজিবুল্লাহ স্যারকেই দিলা, কেন আল্লাহ, হোয়াই...' ঠিক তখন, ২ কিলোমিটার দূরে— গণিতের প্রেমে মুগ্ধ হয়ে উদাস ভঙ্গিতে হাঁটছিল ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের হ্যাংলা-পাতলা একটা ছেলে।

সূর্য প্রায় মাথার ওপর, ছেলেটার ছোট্ট একটা ছায়া পড়ছে মাটিতে। সেই প্রায়-দেখাই-যায়-না-এমন ছায়ার দিকে তাকিয়ে সে ভাবছিল, গণিত আমাদের কী অবিশ্বাস্য সব ক্ষমতা দিয়েছে। সূর্য মাথার ওপর থাকলে ঠিকভাবে ছায়া পড়ে না, শুধু এইটুকু ব্যাপারের ওপর ভিত্তি করে এখন থেকে আড়াই বছর আগে গোটা পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় নিখুঁতভাবে

মেপে ফেলেছিলেন ইরাটোস্থিনিস।

ছেলেটা আকাশের দিকে তাকায়, দেখে একটু করে মেঘ জড় হচ্ছে। রাতে বৃষ্টি হবে— এটাই আবহাওয়ার পূর্বাভাস। পূর্বাভাসে বলে দেওয়া আছে রাত ১২টায় শতকরা ৮০ ভাগ সম্ভাবনা আছে বৃষ্টি হওয়ার! তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, চাপ, বাতাসের গতিবেগ, গতিপথ মেপে গণিত জানিয়ে দিচ্ছে কখন বৃষ্টি হবে! কী দারুণ। প্রযুক্তির উন্নতির সাথে এসব পরিমাপের যন্ত্রপাতি যত নিখুঁত হচ্ছে, কম্পিউটারের হিসাবক্ষমতা যত বাড়ছে, যত বেশি তথ্য বিশ্লেষণ করা যাচ্ছে, তত বেশি নিখুঁত হয়ে উঠছে এই মডেলগুলো।

ছেলেটা রাস্তার দিকে তাকায়, পিচের রাস্তাটায় কী কী জিনিস কী অনুপাতে থাকবে, তার নিখুঁত হিসাব আছে। কী ওজনের গাড়ি কতগুলো চললে কত বছর রাস্তা ভালো থাকবে তার হিসাব আছে। সে যানবাহনগুলোর দিকে তাকায়, ছোট ছোট যন্ত্রগুলো কীভাবে বসালে, গাড়ি কীভাবে চলবে তার জটিল গণিত আছে।

হাতের মোবাইল ফোনটার দিকে তাকায় সে, ছোটখাটো একটা কম্পিউটার এটা। সারা পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করছে এইটুকু যন্ত্র। এখানে বসে সে জেনে ফেলতে পারে, পৃথিবীর আরেক কোনায় কী ঘটছে এই মুহূর্তে। এর পেছনে সবচেয়ে বড় শক্তিগুলোর একটি হলো গণিত। ও ভাবে আর মুগ্ধ হয়।

গাণিতিক ধারণাগুলো ব্যবহার করে মানুষ কত সহজে আপাত-অসাধ্য সব কাজ করে ফেলছে! ছেলেটা, যার নাম তূর্য, অস্থির হয়ে ভাবে, ইশ্, যদি সবাইকে বোঝাতে পারতাম, গণিতের ধারণাগুলো কী অসাধারণ রকম সুন্দর!

শুধু কী কাজে লাগে বলেই গণিত সুন্দর? তূর্য জানে, বিষয়টা মোটেই অমন না। বিশুদ্ধ গণিতের অনেক শাখা আছে, যেগুলো কোনো 'কাজে' লাগানোর জন্য তৈরি হয়নি। সেগুলো যেন শিল্পের

শুধু কী কাজে লাগে বলেই গণিত সুন্দর?

খাতিরে শিল্পের মতো। তার পরতে পরতে আছে বিমূর্ত সৌন্দর্য। তার একেকটা তত্ত্ব যেন মহান চিত্রশিল্পীর আঁকা অপূর্ব চিত্রকর্মের মতো, প্রাজ্ঞ দার্শনিকের চিন্তাভুবন বদলে দেওয়া মতবাদের মতো, শব্দের মায়ায় বোনা অপরূপ দৃশ্যকল্পের কোনো কবিতার মতো। তূর্যের মনে হয়, রাগ-রাগিণীর কাঠামোয় বোনা প্রাণজুড়োনো কোনো গানের সুর আর বিস্ময়কর কল্পনা কিংবা যুক্তিতে সাজানো গণিতের একেকটা ধারণা— কেউ কি কারও চেয়ে কম সুন্দর?

আহারে, গণিতের সৌন্দর্যগুলো যদি সবাই মন থেকে অনুভব করতে পারত! কেউ তাহলে আর কোনো দিন ভয় পেত না গণিতকে। যেই ভুবনের অলিতে-গলিতে এত আনন্দ ছড়ানো, কেন তাকে এত ভয় পায় মানুষ? ভাবতে ভাবতে ওর বুকটা অজানা সব আবেগে থইথই করে ওঠে।

১.৩

ওদিকে আবেগের তীব্রতায় আরেকজন মানুষ অস্থির হয়ে বসে আছে, দুই কিলোমিটার দূরে। এই মুহূর্তে তার আবেগের শতকরা ৪০ ভাগ দুঃখ-কষ্ট, ৩০ ভাগ হতাশা, ২০ ভাগ রাগ আর বাকি ১০ ভাগ লেখকও জানে না। টিনা, যাকে আড়ালে বন্ধুরা ডাকে 'টেনশন টিনা', পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ সেই মেয়েটা পৃথিবীর সব দুঃখ চোখে নিয়ে বসে আছে স্কুলের মাঠের এক কোনায়, মেহেগনি গাছের তলায়। চোখ দুটো ফোলা, গাল লাল, জামার হাতা ভিজে আছে কান্নার জলে। আপাতত তার বান্ধবী নীপা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে— একটু আগে যে ঘটনাটা ঘটেছে এটা তেমন কোনো বিরাট ব্যাপার না— স্যার তো প্রতিদিনই একজনকে নয় আরেকজনকে হেনস্তা করেন। 'তুই তো বেশ কয়েকটা উত্তর ঠিকই দিয়েছিলি, শুধু বোর্ডে ডাকার পর একটা অঙ্ক পারিসনি।'

টিনা অস্থির গলায় প্রতিবাদ জানায়, 'দ্যাখ নীপা, তুই বিষয়টা বুঝতে পারছিস না। এটা শুধু একটা অঙ্ক না, এটা জীবনের ব্যাপার। দ্যাখ, এই সহজ অঙ্কটাই পারি না, আমি নিশ্চিত অঙ্কে ফেল করব। এসএসসিতে রেজাল্ট খারাপ করব। বাবা রাগ হবেন। মা খেপে যাবেন। আমাকে

মেপে ফেলেছিলেন ইরাটোস্থিনিস।

ছেলেটা আকাশের দিকে তাকায়, দেখে একটু করে মেঘ জড় হচ্ছে। রাতে বৃষ্টি হবে— এটাই আবহাওয়ার পূর্বাভাস। পূর্বাভাসে বলে দেওয়া আছে রাত ১২টায় শতকরা ৮০ ভাগ সম্ভাবনা আছে বৃষ্টি হওয়ার! তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, চাপ, বাতাসের গতিবেগ, গতিপথ মেপে গণিত জানিয়ে দিচ্ছে কখন বৃষ্টি হবে! কী দারুণ। প্রযুক্তির উন্নতির সাথে এসব পরিমাপের যন্ত্রপাতি যত নিখুঁত হচ্ছে, কম্পিউটারের হিসাবক্ষমতা যত বাড়ছে, যত বেশি তথ্য বিশ্লেষণ করা যাচ্ছে, তত বেশি নিখুঁত হয়ে উঠছে এই মডেলগুলো।

ছেলেটা রাস্তার দিকে তাকায়, পিচের রাস্তাটায় কী কী জিনিস কী অনুপাতে থাকবে, তার নিখুঁত হিসাব আছে। কী ওজনের গাড়ি কতগুলো চললে কত বছর রাস্তা ভালো থাকবে তার হিসাব আছে। সে যানবাহনগুলোর দিকে তাকায়, ছোট ছোট যন্ত্রগুলো কীভাবে বসালে, গাড়ি কীভাবে চলবে তার জটিল গণিত আছে।

হাতের মোবাইল ফোনটার দিকে তাকায় সে, ছোটখাটো একটা কম্পিউটার এটা। সারা পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করছে এইটুকু যন্ত্র। এখানে বসে সে জেনে ফেলতে পারে, পৃথিবীর আরেক কোনায় কী ঘটছে এই মুহূর্তে। এর পেছনে সবচেয়ে বড় শক্তিগুলোর একটি হলো গণিত। ও ভাবে আর মুগ্ধ হয়।

গাণিতিক ধারণাগুলো ব্যবহার করে মানুষ কত সহজে আপাত-অসাধ্য সব কাজ করে ফেলছে! ছেলেটা, যার নাম তূর্য, অস্থির হয়ে ভাবে, ইশ্, যদি সবাইকে বোঝাতে পারতাম, গণিতের ধারণাগুলো কী অসাধারণ রকম সুন্দর!

শুধু কী কাজে লাগে বলেই গণিত সুন্দর? তূর্য জানে, বিষয়টা মোটেই অমন না। বিশুদ্ধ গণিতের অনেক শাখা আছে, যেগুলো কোনো 'কাজে' লাগানোর জন্য তৈরি হয়নি। সেগুলো যেন শিল্পের

শুধু কী কাজে লাগে বলেই গণিত সুন্দর?

খুবই অসহায় এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্তভাবে হোসনে আরাকে বললেন— আপা, বেশ কয়েক দিন ধরেই আপনার কাছে আসব ভাবছিলাম। আপনার একটা সাহায্য আমাদের খুব দরকার।

বান্টির মা বয়সে হোসনে আরা থেকে অনেক ছোট হবেন, হোসনে আরা সোফায় তার পাশে গিয়ে বসলেন। ভরসা দেওয়ার ভঙ্গিতে কাঁধে হাত রাখলেন। একটু নিচু গলায় বললেন— কী সাহায্য, আপা?

— আসলে আপা, সাহায্যটা লাগবে আপনার ছেলের থেকে। ও তো শুনেছি অঙ্কে খুব ভালো, গণিত অলিম্পিয়াডের সাথে কাজ করে। এই কয়েকটা দিন আমাদের বাচ্চাগুলোকে একটু দেখিয়ে দিক না।

এবারে তন্বীর মা যোগ করলেন— জি আপা, তাহলে আমাদের খুব উপকার হয়। ওদের স্কুলে অঙ্কের এক স্যার আছেন। খুবই ভয়ংকর! প্রতিদিন একটা ছেলে, নাহয় একটা মেয়েকে এমন নাজেহাল করেন! সেটাতে বাচ্চারা কী যে কষ্ট পায়! তার থেকেও বড় ক্ষতি হলো, ওরা স্যারকে ভয় পেতে পেতে এখন পড়ালেখার ব্যাপারটাকেই ভয় পেতে শুরু করেছে।

হোসনে আরা মনে মনে ভাবলেন, এই সমস্যা মনে হয় সারা দেশেই। নিজে শিক্ষক হিসেবে জানেন, অধিকাংশ শিক্ষকই শুধু শেখান প্রশ্নে কী থাকলে উত্তরে কী লিখতে হবে। কেন কী হয় কেউ শেখান না। কেউ শেখান না কোত্থেকে এসব এল আর এসব শিখেই-বা জীবনে কী হবে! ফলে গণিত ব্যাপারটা দাঁড়ায় আন্দাজে কিছু নিয়ম মুখস্থ করে যাওয়ার মতো। অনেকের কাছে নিয়মগুলো সোজা লাগে, তারা পরীক্ষায় ভালো করে, যদিও জানে না নিয়মগুলো আসলে কেন। আর বেশির ভাগ ছেলেমেয়েই এভাবে আন্দাজে অঙ্ক কষে যেতে পারে না, তারা পরীক্ষায় খারাপ করে। তখন ভয় ঢুকে যায় মনে— আমার দ্বারা গণিত হবে না।

হোসনে আরার মায়া হয় বাচ্চাগুলোর জন্য। টিনার মা তন্বীর মাকে বলে— আপনার তন্বীটা তো আপা অনেক ভালো! ও তো গান-বাজনা, অভিনয়, রচনা— কত কিছু করে, পুরস্কার পায়। আমার মেয়েটা তো সারা দিন কিছুই করে না, শুধু দুশ্চিন্তা করে। এইটুকু মানুষ, কী

চাপটাই না নেয়। এভাবে চাপ নিতে থাকলে, মেয়েটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে। অসুস্থ হয়ে যাবে, উঠে দাঁড়াতেও পারবে না। আমাকে সারা দিন ওর পাশে বসে থাকতে হবে। তখন টিনার বাবাকে কে দেখবে? ওই মানুষটাও তো আমাকে ছাড়া নড়তে পারে না। টিনার বাবাও যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে? দুই-দুইটা অসুস্থ মানুষ নিয়ে আমি কীভাবে থাকব? ওদের সেবা করতে করতে রান্নাবান্নার সময়ই পাব না। আপা, আমাদের মনে হয় না খেয়েই থাকতে হবে!

হোসনে আরা, তন্বীর আম্মা, বান্টির আম্মা তিনজনই হেসে ফেললেন। টিনার ভেতরে দুশ্চিন্তার এই বাতিকটা কীভাবে এল তারা পরিষ্কার বুঝতে পারছেন। হোসনে আরা মজা করে টিনার আম্মুকে বললেন, 'আপা, আপনাকে না খেয়ে থাকতে হবে না, আমরা খাবার দিয়ে আসব, চিন্তা নিয়েন না।'

তারপর কী একটা ভেবে একটু গম্ভীর হয়ে হোসনে আরা বললেন— সবই ঠিক হয়ে যাবে, আপা। পৃথিবীতে কিছুর জন্যই কিছু আটকায় না।'

টিনার আম্মু আবার অস্থির হয়ে বললেন— তূর্যকে একটু বলেন না, আমাদের বাচ্চাগুলাকে কয়েক দিন অঙ্ক দেখিয়ে দিক। ওদের মনে অনেক প্রশ্ন, কিন্তু সেগুলো কাউকে করতে পারে না। টিনা আমাকে বলে, কেউই নাকি প্রশ্ন করে না। প্রশ্ন করতে সবাই লজ্জা পায়, সবাই মনে করে অন্যেরা মনে হয় বুঝে ফেলেছে, শুধু ও একা বোঝেনি। তার ওপর একজন প্রশ্ন করলে অন্যেরা নাকি এমন ভাব নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, মনে হয় যেন তারা কত কিছু পারে। তখন প্রশ্নটা যে করেছে তার নিজেকে গাধা মনে হয়। যদিও সত্যি কথা হলো কেউই কিছু বোঝে নাই!

তন্বীর মা যোগ করলেন, আপা, আমার তো মনে হয়, প্রশ্ন না করার আরও বড় কারণ হলো শাস্তির ভয়! একবার নাকি এক বাচ্চা ছেলে অঙ্ক মাস্টারকে কী একটা প্রশ্ন করেছিল। উনি নিজেই সম্ভবত উত্তর জানতেন না, উনি ধরে নিলেন তাকে অপ্রস্তুত করতেই মনে হয় ছেলেটা অমন প্রশ্ন করেছে। বেয়াদবির অপরাধে ওই নিষ্ঠুর লোকটা ছেলেটাকে

এমন জায়গায় পিটিয়েছিল, ওর গোসলখানার আয়না ছাড়া সেই দাগ নাকি আর কেউ দেখেনি! এখন অবশ্য আইন করে পেটানো নিষেধ করা হয়েছে, তাই ওনারা অত্যাধুনিক শাস্তির কায়দা তৈরি করেছেন, যেগুলো শরীরে দেখা যায় না। শুধু মনের মধ্যে কালো দাগ এঁকে দেয়। একবার যে তাদের 'কিঞ্চিত' অপমান শোনে, তার আর স্কুলে আসতে ইচ্ছে করে না।

বান্টির মা দুঃখী চেহারা নিয়ে বললেন— আমার ছেলেটার কথাই ধরেন না। ও লেখাপড়ায় ভালোই ছিল। ও নাকি অনেক প্রশ্ন করে, তাই অঙ্ক মাস্টার ওকে ফেল করিয়ে দিয়েছে। ছেলেটা যদি কারও কাছ থেকে শুধু ওর প্রশ্নগুলোর উত্তর পেত, তাহলেই হতো। এ জন্যই ভাবছিলাম তূর্যের কথা। ও যদি একটু দেখিয়ে দিতে পারত...

কথার মাঝখানেই তূর্য ঢুকল। সবাইকে সালাম দিয়ে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিল, তখন হোসনে আরা ওকে ডেকে পাশে বসালেন। — বাবা, এনারা আসলে তোর কাছেই এসেছেন। কৌতূহলী দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকায় তূর্য। মা বলেন— তুই কি কয়েক দিন টিনা আর তন্বীকে একটু অঙ্ক দেখিয়ে দিতে পারবি?

সত্যি কথা হলো, তূর্যের ইচ্ছা ছিল ছুটিতে কোনো ঝামেলায় যাবে না। তবে মায়ের বাধ্য ছেলে সে। —কোনো অসুবিধা নাই, আম্মু। যদি সন্ধ্যার পর কোনো একসময় ওরা আসতে পারে, আমি দেখিয়ে দিতে পারব।

তূর্য তন্বী, টিনা আর বান্টিকে অঙ্ক দেখিয়ে দেবে শুনে একই ক্লাসের পৃথ্বীর মাও অনুরোধ করলেন হোসনে আরাকে গিয়ে, তার ছেলেটাকেও একটু দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। ঠিক হলো ওরা চারজনই একসাথে পড়বে।

অধ্যায় ২

প্রশ্ন চলুক নির্ভয়ে

২.১.

প্রথম দিন পড়তে এসেই তূর্যের ভক্ত হয়ে গেল ওরা চারজন। তূর্য সারাটা সন্ধ্যা গল্প করেই কাটাল। কী করে গণিত অলিম্পিয়াডে যুক্ত হলো, কোথায় কীভাবে যায়, কী করে সেসব গল্প শোনাল। এরপর ও বলল, গণিত কী অসাধারণ ক্ষমতা দেয় মানুষকে— ভবিষ্যৎ দেখার। ও যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে এমন একটা ভঙ্গিতে বলল, '২০৩২ সালের ১৮ অক্টোবর রাত একটা দুই মিনিটে বাংলাদেশের আকাশে তাকালে দেখবে একটা পূর্ণিমা চাঁদ লাল টকটকে হয়ে যাবে।' শুনে অবাক হয়ে গেল সবাই। তূর্য গণিত নিয়ে অবলীলায় কথা বলে যায় আর ওরা মুগ্ধ হয়ে শোনে। বাসায় ফেরার পথে ওরা তূর্যের একটা নামও দিয়ে দিল— **অঙ্ক ভাইয়া**!

অঙ্ক ভাইয়া ওদের শোনাল সিমুলেশন বা অণুক্রিয়া বলে একটা ব্যাপার আছে, যেটা নাকি প্রকৌশলের প্রায় সব জায়গায় ব্যবহার হয়। একটা যন্ত্র বানানোর আগেই কম্পিউটারে হিসাব করে বলে দেয় যন্ত্রটা কেমন আচরণ করবে। দালানকোঠা বানানোর আগেই হিসাব করে দেয় সে ভার নিতে পারবে কি না। এগুলো তো ভবিষ্যৎ দেখার মতোই একটা ব্যাপার, তাই না! তূর্য গণিতবিদদের নিয়ে মজার গল্প শোনায় ওদের। এসব শুনে ওদের একটু একটু সন্দেহ হতে থাকে, গণিত ব্যাপারটা মনে হয় অনেক আনন্দের! শুধু কেউ কখনো আনন্দটার কথা বলেনি বলেই ওদের যত ভয়।

তবে ওরা সবচেয়ে বেশি খুশি হলো যখন ভাইয়া দুই হাত প্রসারিত করে একগাল হাসি দিয়ে বলল, 'তোমরা আমাকে গণিত নিয়ে ইচ্ছামতো প্রশ্ন করতে পারো, উলটা-পালটা, আবোলতাবোল, যেমন খুশি তেমন।' ভাইয়ার জ্বলজ্বলে চোখ দুটো দেখেই ওদের মনে হচ্ছিল, 'আমাদের কোনো ভয় নেই, আমরা যা খুশি জিজ্ঞেস করতে পারি!' ওদের প্রথম প্রশ্নগুলোতে যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগের কোনো ব্যাপারই ছিল না।

প্রথম প্রশ্ন করল বান্টি। বাকিরা ভয় না পেলেও একটু আড়ষ্ট বোধ করছিল। বান্টি ওদের ক্লাসের সবচেয়ে দুষ্টু প্রকৃতির ছেলেগুলোর একজন, ভয়ডর বলে কিছু নাই। ও একটা ফিচলে হাসি মুখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল,

11=Onety one, 12=Onety two নয় কেন?

ভাইয়া, যদি 21=Twenty one, 22=twenty two হয়, তাহলে 11=Onety one, 12=Onety two হলো না কেন?

তন্বী একটু খেপে গেল প্রশ্ন শুনে, 'এটা কেমন প্রশ্ন? আমরা ভাইয়ার সময় নষ্ট না করে ভালো কোনো প্রশ্ন করি।' ক্লাসের সব রকম অকাজের হোতা, দুষ্টের শিরোমণি বান্টি অন্য সময় হলে কঠিন কোনো জবাব দিয়ে দিত, কিন্তু এখন ও একটু দমে গেল, অঙ্ক ভাইয়ার সামনে এখনই নিজের ওই রূপটা সে দেখাতে চায় না!

তূর্য ভাইয়াই বরং তন্বীকে থামিয়ে দিল। সে হেসে বান্টির পক্ষ নিয়ে বলল, 'প্রশ্নের ভালো খারাপ নিয়ে ভেব না, প্রশ্ন করাটাই বেশি জরুরি। কৌতূহল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার! কখনোই কোনো বন্ধুকে প্রশ্ন করার সময় থামাবে না। এমনকি কোনো শিক্ষকও যদি তোমায় থামিয়ে দিতে চায়, ধরে নেবে সে নিজেই হয়তো ভালো করে ব্যাপারটা জানে না। এমন হলে অন্য কোনোভাবে জানার চেষ্টা করবে, তাই বলে প্রশ্নটা কখনোই মেরে ফেলবে না! এবারে তোমার প্রশ্নে আসি। কেন onety one, onety two হয় না, এটাই তো তোমার প্রশ্ন?' বান্টি হ্যাঁ-সূচক মাথা ঝাঁকাল। জানার আগ্রহ থেকে না, ও আসলে মজা করার জন্যই প্রশ্নটা করেছিল। কিন্তু ভাইয়া এত দারুণভাবে বিষয়টা নিয়েছেন, ওরও

খুব আগ্রহ হচ্ছে ভাইয়া কী বলে সেটা শুনতে।

তূর্য ভাইয়া বলল, 'এই প্রশ্নটা আমার জন্য একটু কঠিন। এখানে গণিত যতখানি তার থেকে বেশি হলো শব্দের ব্যুৎপত্তি (etymology)। ইংরেজি শব্দগুলোর উৎপত্তি কীভাবে হলো সেটা নিয়ে একটা দারুণ ওয়েবসাইট আছে— Online Etymology Dictionary; সেটার ওপর ভিত্তি করেই উত্তর দিচ্ছি—

আমরা যখন লিখি twenty, সেখানে twen অংশটা এসেছে প্রাচীন ইংরেজি থেকে, যেখানে এর মানে ছিল দুই। আর ty এসেছে tig থেকে, যার মানে ছিল 'Groups of ten'। অর্থাৎ twenty মানে হলো— এখানে 'দশ এর দল' আছে দুইটি। একইভাবে এসেছে Thirty, forty এগুলো। যখন একাধিক 'দশ এর দল' থাকে তখন প্রাচীন ইংরেজরা এমন করে বলত। এখন দেখো, যদি একটাই মাত্র দশ থাকে, তখন আর কতগুলো 'দশ এর দল' আছে সেটা ভেবে লাভ কী? একটা দশ এর দল বা 'onety' না বলে তারা শুধু বলত 'দশ' বা 'ten'। এভাবে চিন্তা করতে পারো, আগে তো 'দশ' কী জিনিস সেটা বলতে হবে, তারপর 'দশ এর দল'।

ten-এর পরে eleven এসেছে elleovene শব্দটা থেকে, যার মানে ছিল 'one left'— বা একটা অতিরিক্ত। এই শব্দটা যখন তৈরি তত দিনে গণনায় ১০ ভিত্তিক সংখ্যা প্রায় প্রতিষ্ঠিত। ধরে নেওয়া যায়, ব্যাপারটা এমন— কেউ হয়তো গুনছিল। ১০টা গোনার পরে দেখল আরও একটা অতিরিক্ত পড়ে আছে। এই হলো eleven— এগারো।

একইভাবে twelve এসেছে twelf থেকে, যার মানে 'two left' বা দুইটা অতিরিক্ত। এরপর thirteen, fourteen.. এগুলোতে—teen এসেছে 'tiene' থেকে যার মানে হলো 'ten more than'. Thirteen মানে হলো 'ten more than three' বা 'তিনের থেকে আর দশ বেশি!' একটু উল্টো শোনাচ্ছে, না? 'দশের থেকে আর তিন বেশি' হলে বেশি সুন্দর লাগত। কী করা যাবে— যেভাবে এসেছে, সেভাবেই জানালাম তোমাকে।'

1th 2th 3th হলো না কেন?

এবার টিনা হাত তুলল, 'এ-জাতীয় একটা প্রশ্ন আমারও আছে। 1st 2nd 3rd এরপর 4th 5th 6th। 1th 2th 3th নয় কেন? মানে th দিয়েই যদি সব করবে তো 1st 2nd 3rd এর কী দরকার ছিল...?'

আমাকে তো বিপদে ফেলে দিলে, আমি যতটুকু জানি সেটা বলি। 1st তো First-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এই First এসেছে প্রাচীন ইংরেজি (Old English) ভাষার 'fyrst' শব্দ থেকে, যার অর্থ 'আদি, শুরু বা প্রাথমিক'।

এই যে শেষে '-th' থাকাটা এটাও এসেছে প্রাচীন ইংরেজি থেকে। যদিও সেসময় এই th দিয়ে ওরা লিখত না। ওরা লিখত এই আজব প্রতীকটা দিয়ে 'þa'। þ ছিল ইংরেজির অনেক পুরোনো একটা অক্ষর, যেটার উচ্চারণ ছিল আমাদের বাংলা 'থ'-এর মতো। এরপর 'second' ইংরেজিতে এসেছে প্রাচীন ফ্রেঞ্চ ভাষা থেকে, প্রাচীন ফ্রেঞ্চ সেটা পেয়েছে লাতিন শব্দ secundus থেকে। এর মানে ছিল 'পরেরটা'। মানে বুঝতেই পারছ— 'প্রথমটার পরেরটা'।

তারপর 'Third' এসেছে প্রাচীন ইংরেজি শব্দ থ্রিড্ডা (þridda), এটার মানেই ছিল 'তিন'।

সাড়ে এক, সাড়ে দুই নাকি দেড়, আড়াই?

এরপরে আলাদা করে এমন কোনো ক্রমবাচক শব্দ ওদের আর ছিল না। আর কী করা? তখন নম্বরের শেষে –th লাগিয়ে শব্দ বানিয়ে ফেলল। প্রথম তিনটা যেহেতু আগে থেকেই প্রচলিত ছিল, ওগুলো আর তারা বদলায়নি। বাংলায় দেড়, আড়াই এই শব্দগুলোর কথা ভাবো। এক এবং অর্ধেক মিলিয়ে দেড়। দুই আর অর্ধেক মিলিয়ে আড়াই। কিন্তু এমন করে কতগুলো শব্দ বানাবে মানুষ। তাই এরপর 'সাড়ে' ব্যবহার করে কাজ চালিয়ে নিয়েছি আমরা। সাড়ে তিন, সাড়ে চার, এমন অনন্তকাল। এ প্রসঙ্গে বলি, বাংলায় দেড় শব্দটা এসেছে সংস্কৃত দ্বি+অর্ধ= দ্ব্যর্ধ থেকে। সন্ধিতে ঠিক আছে, তবে

বান্টি ফোড়ন কাটল— এটা আসলে বিয়োগ হবে ভাইয়া! দ্বি বিয়োগ অর্ধ, তাহলে ঠিক থাকে।

তন্বী উৎসুক মুখে জিজ্ঞেস করল— আর আড়াই শব্দটা কীভাবে এল?

— এটা উৎপত্তি অর্ধ+দুই থেকে। ওখান থেকে প্রাকৃত ভাষায় 'আড়্ঢাইয়', সেখান থেকে আড়াই। এটা ঠিকই আছে!

পৃথিবীতে অঙ্ক কয়টা?

পরের প্রশ্নটা করে পৃথ্বী— এক বড় ভাই আমাকে বলেছিলেন, দুনিয়াতে অঙ্ক আছে মাত্র দশটা— ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯। এই দশটা প্রতীক দিয়েই সব লেখা যায়। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, শুধু ১০টাতেই থেমে গেল কেন? কেন আরও প্রতীক আসল না?

তূর্য ভাইয়া একটু হেসে বললেন— ওনার কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। দেখো, এই দশটা দিয়ে সব লেখা যায় এটা সত্যি, তার মানে এই না যে প্রতীক ঠিক দশটাই আছে। সংখ্যার ভিত্তি বলে একটা ব্যাপার আছে। আমরা সাধারণভাবে যেভাবে লিখি, সেটা হলো ১০ ভিত্তিক সংখ্যাব্যবস্থা। এখানে ১০টি প্রতীক। কিন্তু সংখ্যাব্যবস্থা ২ ভিত্তিকও হতে পারে! কেউ দুই ভিত্তিতে লিখতে চাইলে শুধু ০ আর ১ দিয়েই সব সংখ্যা লেখা সম্ভব। আবার প্রাচীন ব্যাবিলনে ব্যবহার করা হতো ৬০ভিত্তিক সংখ্যাব্যবস্থা, সেখানে এই ১, ২, ৩-এর প্রতীক ছাড়াও ১০-এর জন্য আলাদা প্রতীক ছিল। কম্পিউটারে খুবই প্রচলিত হলো ১৬ভিত্তিক সংখ্যাব্যবস্থা, যেখানে ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, A, B, C, D, E, F এই ১৬টা প্রতীক ব্যবহার হয়। তাই ১০-এই শেষ হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। মজার ব্যাপার কী জানো, অধিকাংশ ইতিহাসবেত্তা মনে করেন, প্রাচীন মানুষ গণনার জন্য তাদের হাতের আঙুল ব্যবহার করত। আমাদের হাতে যেহেতু ১০টা আঙুল, তাই ১০ ভিত্তি ব্যবহার করাটা ছিল সহজ। আমরা এখন যে ১০ভিত্তিক সংখ্যাগুলো লিখি, সেখানে আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের কিন্তু একটা বড় অবদান আছে। কেউ কি জানো সেটা?

সাথে সাথে হাত তুলল তন্বী— জি ভাইয়া, শূন্যের আবিষ্কার হয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশে।

ঠিক তাই। আর বাকি প্রতীকগুলো আরবদের তৈরি। এই সংখ্যাগুলোকে তাই হিন্দু-আরব সংখ্যাপ্রতীক বলে।

০ আবিষ্কারের আগে ১০, ২০ লিখত কিভাবে?

টিনাকে কিছুটা বিভ্রান্ত দেখাল— ০ আবিষ্কার হলো ভারতীয় উপমহাদেশে। তাহলে এর আগে, কিংবা অন্য জায়গায় ১০, ২০, ৩০, ৪০ ইত্যাদি কীভাবে লেখা হতো?

তূর্য ভাইয়া বলল, এর আগে একেক জায়গায় একেকভাবে লেখা হতো! অধিকাংশ জায়গায় ১০-এর জন্য আলাদা প্রতীক ছিল! মিসরে হায়রোগ্লিফিক লিপিতে ১০ ছিল ∩-এর মতো দেখতে! ১০, ২০, ৩০ ছিল ∩, ∩∩, ∩∩∩।

রোমানরা লিখত X দিয়ে যেটা এখনো প্রচলিত। X, XX, XXX ছিল ওদের ১০, ২০, ৩০।

মধ্য আমেরিকার মায়াসভ্যতা ছিল ২০ভিত্তিক! ওখানে ১০-এর জন্য যে প্রতীক সেটা ছিল = এর মতো! ২০-এর প্রতীক ছিল • এর মতো! ৩০ লিখতে হলে ওই সমান চিহ্নের মতো চিহ্নটার ওপরে ডটটা বসাতে হবে! বুঝতেই পারছ, শূন্য হওয়ায় কাজ সহজ হয়ে গেছে অনেক।

পৃথ্বী বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ল। এতক্ষণ তন্বী অপেক্ষা করছিল একটা প্রশ্ন করার জন্য। এবার সে সুযোগ পেল।

বাংলাদেশের আয়তন, নাকি ক্ষেত্রফল ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি?

ভাইয়া, আমার প্রশ্নটা বাংলাদেশ নিয়ে। অনেক দিন ধরেই ভেবেছি প্রশ্নটা কাউকে করব, ভয়ে করা হয়ে ওঠেনি। এই যে আমরা বলি বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ 'বর্গকিলোমিটার'। এমন কেন বলা হয়? আয়তনের একক তো ঘন... আর যদি বর্গ কিমিই বলতে হয়, তাহলে ক্ষেত্রফল বলি না কেন?

তূর্য খানিকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এই প্রশ্নটা আমি প্রায়ই পাই, কেন যে এটা এখনো ঠিক করা হলো না! প্রথম কথা হলো, এখানে বর্গকিলোমিটার এককটা ঠিকই আছে, সমস্যা 'আয়তন' শব্দটায়। এটা আসলে Area, যেটা দিয়ে বোঝায় দ্বিমাত্রিক একটা ক্ষেত্র কতটুকু জায়গা দখল করে। আমি নির্দ্বিধায় মনে করি, এটাকে ক্ষেত্রফল বলা উচিত, তাহলে বিভ্রান্তিটা আর থাকে না।

এখানে মূল সমস্যাটা হয়েছে বাংলা অনুবাদের। কেউ কেউ Area শব্দটার অর্থ বাংলা করেছিলেন আয়তন আর কেউ করেছিলেন ক্ষেত্রফল। বাংলা অভিধানে দেখবে আয়তন আর ক্ষেত্রফল সমার্থক। কিন্তু এখন গণিত আর বিজ্ঞান বইগুলোতে আমরা স্পষ্টভাবেই দুটো শব্দকে আলাদা করে ফেলেছি। আমরা ব্যবহার করি Area-এর বাংলা ক্ষেত্রফল, যেটার একক হলো বর্গমিটার, বর্গসেমি এমন। আর Volume শব্দটার বাংলা হলো আয়তন, যেটা দিয়ে বোঝায় তিন মাত্রায় একটা বস্তু কতটুকু জায়গা দখল করে। এটার একক ঘনমিটার, ঘনসেমি ইত্যাদি।

এই যে যখন আমরা বলি, '১৪৭৫৭০ বর্গকিমি', এটা দিয়ে আমরা যেটা মাপি সেটা কিন্তু তিন মাত্রার পরিমাপ না। এটা স্রেফ জমির মাপ, যেটা দ্বিমাত্রিক। বাংলাদেশের মোট জমি কতটুকু সেটার মাপ হলো ১,৪৭,৫৭০ 'বর্গকিলোমিটার'। ইংরেজিতে এটাকে কখনোই ভলিউম বলে না, বলে Area। Wikipedia-তে গিয়ে সারা পৃথিবীর সব দেশের Area দেখতে পাবে, দেখবে সব খানেই একক বর্গকিমি। এ জন্য সব বইয়ে ক্ষেত্রফল বলাটাই যুক্তিযুক্ত। তাহলে ছেলেমেয়েরা অযথা বিভ্রান্ত হবে না।

পৃথ্বী মাথা চুলকে বলল, কিন্তু ভাইয়া, বাংলাদেশ তো দুই মাত্রিক না। আমার জানা মতে, আকাশমণ্ডলীও একটা দেশের অংশ। নইলে এক দেশের ওপর দিয়ে আরেক দেশের বিমান যেতে অনুমতি লাগে কেন? কোনো দেশের জায়গা মাপার সময় আকাশমণ্ডলীও হিসাবে ধরার কথা...। সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে আয়তন কথাটা আসে...।

তূর্য পরিষ্কার করল, তোমার কথায় যুক্তি আছে। আকাশমণ্ডলী দেশের অংশ এটাতে সন্দেহ নেই। আর আকাশমণ্ডলীকে হিসাবে ধরলে

আয়তন বলতে হবে এতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি বলছি কী করা হয়। সত্যিটা হচ্ছে এই ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিমির হিসাবের ভেতরে আকাশমণ্ডলীর কোনোই ব্যাপার নেই। হিসাবটা আরও সোজা। ধরা যাক তোমার ১ বিঘা জমি আছে। তোমার প্রতিবেশীর আছে ১ বিঘা! কয়েক বিঘা আছে নদীর ভেতর। এমন করে সারা দেশের সব জমি মাপলে পাওয়া যাবে ১০ কোটি ৯৩ লাখ ১১ হাজার ১১১ বিঘা। এক বিঘা = ০.০০১৩৫ বর্গকিমি, তাহলে ১০,৯৩,১১,১১১ বিঘা হবে ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিমি! ব্যাপারটা এইটুকুই, স্থলভাগ-জলভাগ সব মিলিয়ে দেশের সব জমির যোগফল হলো তার ক্ষেত্রফল। আমার মনে হয় এটা ধীরে ধীরে বইগুলোতে শুধরে নেবে।

পৃথ্বী এখনো যেন মানতে চায় না। ভাইয়া, তাহলে কি বাংলাদেশের আয়তন বলে কিছু হতে পারে না?

তূর্য বলল, অবশ্যই পারে। চলো চিন্তা করি সেটা কী হবে। প্রথমে মনে করি পৃথিবী সমতল।

এটা বলেই তূর্য হেসে ফেলল, জানো, এই যুগেও বহু মানুষ বিশ্বাস করে পৃথিবী সমতল। গোলাকার পৃথিবীর হিসাব মেনে প্রতিদিন লাখ লাখ বিমান ছুটে যাচ্ছে এ মাথা থেকে ও মাথায়। স্যাটেলাইট, মোবাইল ফোনে কোটি কোটি মানুষ যোগাযোগ করছে— সেখানে লাগে গোলক-পৃথিবীর নিখুঁত মডেল। মহাকাশ থেকে পাঠানো হাজার হাজার গোলক আকৃতির ছবি— এই সব থাকার পরেও কিছু মানুষ এভাবেই ভাবতে থাকে, কী হাস্যকর!

বাংলাদেশের আয়তন কত ঘন কি.মি?

যাহোক আবার বাংলাদেশের আয়তনে ফিরি। বাংলাদেশকে ধরলাম সমতল। সমতল জায়গার ক্ষেত্রফলের সাথে উচ্চতা গুণ করলেই আয়তন পাবে। কিন্তু সেই উচ্চতাটা কত? কত ওপরে গেলে আর বাংলাদেশ থাকবে না? আরও ভালো করে বললে, কোন উচ্চতার পরে আর পৃথিবী থাকবে না, থাকবে শুধু মহাশূন্য? এটা নিয়েও সব

সুইজারল্যান্ডের সংগঠন 'Fédération

একটা উচ্চতার। তারা প্রস্তাব করেছে ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০০ কিমি উচ্চতায় একটা সীমানারেখা কল্পনা করতে। এর নিচে পৃথিবী, ওপরে গেলে শুরু হয় মহাশূন্য। আবার আমেরিকা বলে, কেউ ৮০ কিমির উঁচুতে ভ্রমণ করলেই তাকে নভোচারী বলা হবে। কী ঝামেলা! তো চলো, আমরা কারমান রেখাটাকেই আদর্শ ভাবি। ধরলাম বাংলাদেশের ওপরে যে বায়ুমণ্ডল আছে, এটার উচ্চতা গড়ে ১০০ কিমি। তাহলে বাংলাদেশের আয়তন বা ভলিউম হবে ১৪৭৫৭০×১০০= ১,৪৭,৫৭,০০০ ঘনকিমি। এবার কিন্তু আমাদের একক হবে ঘনকিমি। তবে, এখানে একটা বড় 'কিন্তু' আছে। ভূপৃষ্ঠের শুধু ওপরের বায়ু দেখলেই চলবে? দেশের মাটির তলায় যদি রত্ন পাওয়া যায়, সেটা কি দেশের সম্পদ না?

তাই তো, এটার কথা তো ভাবি নাই!

হ্যাঁ, তাহলে মাটির তলার জায়গাটাও তো আয়তনের ভেতরে নিতে হবে। এবং সত্যি হলো, মাটির ওপরে দেশের জায়গা যতটুকু, নিচে তার চেয়ে অনেক বেশি। পৃথিবীটা তো প্রায় গোলক আকৃতির, যার গড় ব্যাসার্ধ প্রায় ৬৩৭০ কিমি। তার মানে মাটির তলায় ৬৩৭০ কিমি গেলেও সেটা বাংলাদেশের থাকবে!

এরপর তূর্য একটা হিসাব করল। ও বলল, এই সব ক্ষেত্রে আয়তনের হিসাব করা যায় একটা গোলকের চাপ চিন্তা করে। গোলকের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল $4\pi R^2$ আর আয়তন $\frac{4}{3}\pi R^3$ এটা তো তোমরা জানো, তাই না?

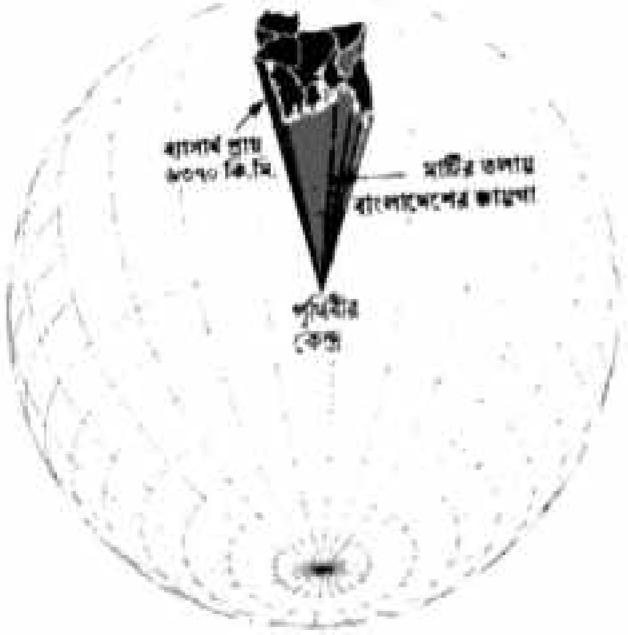

জানি, কিন্তু কেন হয়, সেটা জানি না।

আচ্ছা সেটা আমি বুঝিয়ে দেব, আজকে ওটা জানো ধরে নিয়েই হিসাবটা করি। তূর্য খাতায় লিখল ঐকিক নিয়মের মতো করে—

ক্ষেত্রফল $4\pi R^2$ হলে কেন্দ্রে আয়তন হয় $\frac{4}{3}\pi R^3$

ক্ষেত্রফল 1 ,, ,, ,, ,, $\frac{(\frac{4}{3})\pi R^3}{4\pi R^2}$

ক্ষেত্রফল 147570 ,, ,, ,, ,, $\frac{(\frac{4}{3})\pi R^3}{4\pi R^2} \times 147570$

ব্যাসার্ধ R-এর মান ও বসালো ৬৩৭০ কিমি। তাতে আয়তন দাঁড়াল ৩১,৩৩,৪০,৩০০ ঘনকিমি। এটা হলো বাংলাদেশের মাটির তলায় কতটুকু জায়গা আছে, সেটার একটা অনুমান। তাহলে মাটির ওপরের অংশের সাথে যোগ দিলে পাওয়া যাবে (১,৪৭,৫৭,০০০ + ৩১,৩৩,৪০,৩০০)= ৩২,৮০,৯৭,৩০০ ঘনকিমি।

হিসাব শেষ করে তূর্য হাসল। এই নাও, এটা হলো বাংলাদেশের আয়তন। এটাকেই যেন আসল আয়তন মনে করো না! আমি একেবারে প্রাথমিক, একেবারে সরল একটা অনুমান করলাম। নিখুঁতভাবে করতে গেলে আয়তন বের করা অনেক কঠিন। আমি যে ওপরের অংশকে সমতল ধরলাম সেটা ঠিক না। সেটাকে গোলকের অংশ ধরলে আয়তন আরেকটু বেশি আসত, আরেকটু ভালো অনুমান পেতাম। সেটা করা সহজ[১], তবে সেটাও একশ ভাগ নিখুঁত হতো না। কারণ পৃথিবীটা সুষম গোলক না, একেক অক্ষাংশে এর ব্যাসার্ধ একেক রকম। গোলকের হিসাব ঠিক থাকবে না সব সময়। আবার আকাশসীমা ঠিক কতখানি, এটা নিয়ে সংশয়ের কথা তো বললামই। এসব কারণে আয়তন না নিয়ে ক্ষেত্রফল ভাবাটা সহজ। সাধারণ মানুষের হিসাবের জন্য, দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারের জন্য জমির ক্ষেত্রফল মাপাটাই সুবিধাজনক।

এবার আর পৃথ্বীর কোনো দ্বিধা রইল না, সে বুঝল ক্ষেত্রফল বলাটাই কেন যুক্তিযুক্ত।

এমন সব প্রশ্নের মাঝে কখন দুই ঘণ্টা পার হয়ে গেছে কেউ বুঝতেই পারেনি। আইনস্টাইন আপেক্ষিকতা বোঝাতে একবার নাকি মজা করে বলেছিলেন, ভালো সময় দ্রুত কাটে। তূর্যের মনে হলো সবাই অনেক ভালো সময় পার করছে। ওদের আর কটা দিন দীক্ষা দিলেই গণিতে আর ওরা ভয় পাবে না!

তূর্য টেবিলের ওপর একটা বই দেখিয়ে বলল, এই বইটার তলায় চারটে ভাঁজ করা কাগজ আছে চারজনের জন্য, সেখানে তোমাদের জন্য আছে একটা ধাঁধা। এটা এখন খোলো না, নিয়ে যাও সাথে করে! ভেবো সময় পেলে!

বর্গপুকুর ধাঁধা

সবাই বের হয়ে এল দারুণ উৎসাহ নিয়ে। এত দিন পরে কাউকে পেয়েছে যাকে মন খুলে প্রশ্ন করা যায়! আর ধাঁধার কাগজে কী লেখা, সেটা নিয়েও দারুণ কৌতূহল মনের ভেতর। টিনা তো উত্তেজনা দমনই করতে পারল না, রাস্তায় পৌরসভার সড়কবাতির টিমটিমে আলোতেই পড়ে ফেলল তার কাগজে কী লেখা—

বর্গাকার এক পুকুর ছিল— পুকুর ভরা মাছ,

চারটে কোনায় পোঁতা ছিল চারটে পুরোনো গাছ!

পুকুরটাকে বাড়াতে হবে, ক্ষেত্র হবে দ্বিগুণ।

গাছ কেটো না! বাড়ির মালিক রেগেই হবে আগুন!

পুকুর যেন বর্গই থাকে, এটাও রেখো স্মরণ!

বলো দেখি, কেমন হবে পুকুর কাটার ধরন?

রাতে খাবার পর টিনা খাতা-কলমে এঁকে ফেলল ছবিটা। সমাধান করতে বেশি সময় লাগল না ওর।

ওদিকে তূর্য মনে মনে হাসে, প্রথম দিনের ধাঁধা তো, বেশি কঠিন কিছু দিইনি। ধাঁধা আরও আসবে, তোমাদের ভাবিয়ে ভাবিয়ে গণিতে দারুণ আগ্রহী করে তুলব, এটা আমার চ্যালেঞ্জ!

---

[১] সেক্ষেত্রে দুইটা গোলক ভাবলেই হয়, একটার ব্যাসার্ধ ৬৩৭০ কি.মি.। আরেকটা একটু বড়, উপরের আকাশসীমাসহ। সেটার ব্যাসার্ধ (৬৩৭০+১০০)=৬৪৭০ কি.মি.। পুরো গোলকের আয়তন যখন (৪÷৩)×π×৬৩৭০^{৩}, তখন ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত বাংলাদেশের আয়তন ৩১,৩৩,৪০,৩০০। তাহলে পুরো গোলকের আয়তন যখন (৪÷৩)×π×(৬৩৭০+১০০)^{৩}, তখন আকাশসীমা পর্যন্ত বাংলাদেশের আয়তন হবে ৩১,৩৩,৪০,৩০০÷(৪÷৩)×π×৬৩৭০^{৩}×(৪÷৩)×π×(৬৩৭০+১০০)^{৩}=৩২,৮৩,৩০,১৭৬ ঘন কি.মি.।

অধ্যায় ৩

সংখ্যা নিয়ে সংশয়

৩.১

চার বছর আগে এই শহরে প্রথম এসেছে তূর্য। এই কয়েক বছরেই শহরটাকে খুব আপন মনে হয় তার। বুয়েটে ড. এম এ রশীদ হলে নিজের ঘরে বসে যখন মন খারাপ লাগে, তখন সে চোখ বুজে এই শহরটাকে দেখে। আর ছুটিতে এলে প্রায়ই দুপুরের একটু আগে ঘুরতে বের হয় সে, একাই। কখনো প্রিয় সাইকেলটা নিয়ে, কখনো বা হেঁটেই। আজও মূল সড়কের ফুটপাত ধরে হাঁটছিল সে, আনমনে। হাঁটতে হাঁটতে তার কলেজের এক প্রিয় শিক্ষকের উক্তি মনে পড়ে।

বাবারে, যা কিছু চোখের সামনে দেখিস, দেখলেই সব 'জ্ঞান' হয়ে যায় না, সব মাথায় থাকে না। সেগুলো জ্ঞান বানাতে লাগে 'চিন্তা'। বাসা থেকে বের হয়ে রাস্তায় চলতে চলতে যতগুলো দোকান দেখিস, তার কতগুলোর নাম মনে করতে পারবি? অধিকাংশই পারবি না। কিন্তু মোড়ের দোকানে 'তূর্য জেনারেল স্টোর'টার নাম কিন্তু ঠিকই মনে থাকে। কেন? কারণ ওটা দেখলেই তোর মনে হবে, আরে, এটা তো আমার নামে নাম। এই যে একটু চিন্তা করলি, এটা খুব জরুরি। তোর ভাবনাটা তোর মাথার ভেতরে নিউরনগুলোর মাঝে একটা সেতুবন্ধন তৈরি করবে। চিন্তাটা ছাড়া ওই সেতু তৈরি হবে না...। এটা জানা থাকলে জীবনে অনেক কিছু সহজে করা যায়। ধর, কিছু একটা আছে যেটা তুই মনে রাখতে চাস, কিন্তু কিছুতেই মনে রাখতে পারছিস না। বারবার ভুলে যাচ্ছিস। চেষ্টা কর, ওটা নিয়ে একটা ছন্দ বাঁধার, কিছু একটা তৈরি করার। দেখবি ছন্দ বাঁধতে পারিস আর না পারিস ওই ব্যাপারটা মনে থাকবে। এই যে তুই ভাবছিস, চিন্তার চেষ্টা করছিস, ঐটুকুই দরকারি। এটাই নতুন নতুন স্মৃতি, নতুন নতুন জ্ঞানের বন্ধন তৈরি করে ফেলবে।

কলেজে পড়ার সময় কথাগুলো মনে অতটা দাগ কাটেনি, কিন্তু এখন তূর্য অনুভব করে, ব্যাপারটা ঠিক তা-ই! শুধু চিন্তা করেও অনেক কিছু বের করে ফেলা যায়। তার মনে পড়ে 'Alphabet' শব্দটা কোত্থেকে এল—এটা ভাবতে গিয়েই সে বুঝে ফেলেছিল, এটা নিশ্চয়ই গ্রিক অক্ষর আলফা আর বেটা যোগ করে হয়েছে! কেউ কিন্তু তাকে বলে দেয়নি, ভাবতে গিয়েই বুঝে ফেলেছে। জানা আর না জানার ভেতরে পার্থক্য শুধু ওই চিন্তার সময়টা!

এই সব ভাবতে ভাবতে সে খেয়াল করে হাঁটতে হাঁটতে বাপ্টি-তন্বীদের স্কুলের কাছে পৌঁছে গেছে। স্কুলের দিকে তাকিয়ে গতকালের কথা মনে হয়। পৃথ্বী খুব মন খারাপ করে বলছিল গণিত কেন ভালো লাগে না, তার কথা। শুধু একটা ছোট সূত্র ভুলে যাওয়ায় নজিবুল্লাহ স্যার বাবা-মা তুলে কী অপমানটা তাকে করেছে, খুব কষ্ট নিয়ে বলছিল পৃথ্বী। শুনে রাগ হয়েছিল তূর্যর, মনে হয়েছিল যদি কখনো লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে কিছু কথা বলা যেত। গণিতের মতো একটা ভালোবাসার বিষয়কে যে এমন বাজে ব্যাপার বানিয়ে ফেলতে পারে, তাকে কড়া কিছু কথা শুনিয়ে দেওয়া উচিত।

তূর্য তখনো জানত না আর দুই সপ্তাহ পরেই তাকে মুখোমুখি হতে হবে নজিবুল্লাহ স্যারের। অনেক প্রস্তুতি নিয়ে যাবে সে, কিন্তু তূর্যর মনমতো কিছুই ঘটবে না সেই দিন!

৩.২

সন্ধ্যা ছয়টার আসার কথা ছিল টিনা-তন্বীদের। ওরা পাঁচ মিনিট আগেই এসে হাজির। তূর্য বুঝল ওদের মধ্যে আগ্রহ জন্মাচ্ছে। সে পড়ানো শুরু করল আজ সকালে যা ভাবছিল সেটা ওদের সাথে ভাগ করে নিয়ে। চিন্তা করাটা যে জরুরি সেটা বোঝাতে ও উদাহরণ টানল মুরগির!

চিন্তা থেকেই মানুষ তৈরি করে কাল্পনিক সব ধারণা। আর সেগুলো কী অবলীলায় মিশে যায় তার বাস্তব জগৎটার সাথে। একটা দুই পাআলা একটা পাখি হাঁটছিল, যার ওড়ার প্রতি কোনো আগ্রহ নাই। হয়তো কেউ সেটার একটা 'নাম' দিয়ে দিল— 'মুরগি'। এই মুরগি নামটা নিয়ে কিন্তু সে জন্মায়নি। সব ভাষায় তাকে 'মুরগি' বলেও না। তবু এই যে নামটা মানুষ দিল, তাতে কিন্তু লাভ হলো অনেক। একটা শব্দ বললেই বাংলাভাষী সবাই বুঝে যায় কোন পাখিটাকে বোঝানো হচ্ছে। খাদ্যপ্রেমী কেউ কেউ শব্দটা শোনার সাথে সাথে রোস্ট, ঝাল-ফ্রাইজির মতো উপাদেয় তরকারিও কল্পনা করে ফেলতে পারে।

এটুকু বলার পর গণিতের রাজ্যে ঢুকে গেল তূর্য।

সংখ্যার শুরু কোথায়?

এমন একটা কাল্পনিক ধারণা হলো 'সংখ্যা'। কোনটাকে 'এক' বলবে, কোনটাকে 'দুই', এটা মানুষ তার কল্পনা দিয়ে নাম দিয়েছে। ঠিক কতটা জিনিস আছে, এসব গুনতে মানুষ একসময় দাগ দিয়ে পাথরের গায়ে লিখে রাখত। এটাকে বলে টালি করা। ধরো, ভেড়ার রাখাল তার কতগুলো ভেড়া আছে গুনতে চায়। সে একটা ভেড়ার জন্যে হয়তো একটা দাগ দিত। সেটার শুরুও প্রায় ৪০ হাজার বছর আগে।

বান্টি দাঁত কেলিয়ে বলল, অত আগের জিনিস মানুষ কী করে জানল?

অনেক অনেক বছর আগে জিনিসপাতির বয়স বের করত কিভাবে?

তূর্য বোঝাল, দক্ষিণ আফ্রিকার লেবোম্বো পর্বতে একটা বেবুনের হাড় পাওয়া যায়, যার গায়ে অনেকগুলো দাগ কাটা। বহু গবেষণায় মানুষ নিশ্চিত হয় যে এটা কোনো মানুষেরই কাজ। তারা গণনার কাজে এটা ব্যবহার করেছিল। এরপর গবেষণা করা হয় এই হাড়টা কত বছর আগের সেটা বের করার। সেটা করার জন্য কার্বন ডেটিং বলে একটা ব্যাপার আছে। প্রাণী বা জীবদেহে অনেক কার্বন পরমাণু থাকে, যার মধ্যে বেশ কিছু থাকে সাধারণ কার্বন থেকে ভারী বিশেষ একধরনের কার্বন পরমাণু, যারা তেজস্ক্রিয়! জীবটি যখন জীবিত থাকে তখন প্রকৃতিতে অন্য জীবের সাথে এই তেজস্ক্রিয় কার্বন আদান-প্রদান করতে পারে। মরে গেলে সেটা আর পারে না। তখন কী হয়?

যেকোনো তেজস্ক্রিয় পরমাণু খুব আস্তে আস্তে বিভিন্ন রশ্মির আকারে শক্তি বিকিরণ করতে থাকে, করতে করতে সেটা অন্য পরমাণু হয়ে যায়। তেজস্ক্রিয় কার্বনও এভাবে বেটা রশ্মি বিকিরণ করতে করতে কার্বন থেকে নাইট্রোজেন হয়ে যায়! এখন এই তেজস্ক্রিয় কার্বন কত সময় ধরে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ করে, সেটা মানুষের জানা আছে। প্রকৃতিতে সাধারণ কার্বন আর তেজস্ক্রিয় কার্বনের অনুপাত কেমন তার থেকে সে বলতে পারে শুরুতে তেজস্ক্রিয় কার্বন কতটুকু ছিল। আর এখন নাইট্রোজেন কতটুকু সেটা থেকে বোঝা যায় কতটুকু তেজস্ক্রিয় কার্বন ক্ষয় হয়ে গেছে এর মাঝে। এই তথ্যগুলো থেকে সে বলে দিতে পারে, ওই জীবটা আসলে কত আগের। তো গবেষকেরা দেখেছেন ওই লেবোম্বো হাড়টা ছিল ৪৪ হাজার বছর আগের!

পৃথ্বী চোখ বড় বড় করে, হাঁ করে শুনছিল। ক্লাসে ওর চেয়ে বড় হাঁ আর কারও নেই। পৃথ্বীকে যখন স্যারেরা বকা দেন, সে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। যখন বৃষ্টি হয়, জানালা দিয়ে সে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। যখন কেউ হাসির কথা বলে, যখন তন্বী গান করে, যখন বান্টি বিটলামো করে, সে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। স্যার-ম্যাডামরা যখন ক্লাসে পড়ান, তখনো সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। সে যেভাবে ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে তাকায়, জুলিয়েটও কোনো দিন রোমিওর দিকে ওভাবে তাকায়নি। বন্ধুরা বিশ্বাস করে নিশ্চয়ই কিছু ফলের মাছি তার আশ্চর্য হাঁ দিয়ে প্রায়ই তার মুখের ভেতরে ঢুকে যায়, ভেতরে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে বিভ্রান্ত হয়ে আবার বেরিয়ে যায়। পৃথ্বীকে ক্লাসের সবাই ডাকে 'অবাক পৃথিবী'। এখন ওকে ভাইয়ার দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে বান্টি ওর মুখের ওপর একটা তুড়ি বাজাল, এই অবাক, বেঁচে আছিস, না কার্বন ডেটিং করব?

একটু অপ্রস্তুত হয়ে সে তূর্য ভাইয়াকে বলল, কী সাংঘাতিক! গণিত তো দেখি টাইম-ট্রাভেলও করতে পারে। এত আগের ব্যাপারস্যাপারও বলতে পারে?

তূর্য বলল, হ্যাঁ! এই লেবোম্বো হাড়ে যেভাবে দাগ ছিল তাতে বোঝা

যায়, ওরা শুধু গুনতেই পারত। হয়তো যোগ-বিয়োগ কিছুটা বুঝত— সংখ্যা কমে যাওয়া-বেড়ে যাওয়া থেকে, কিন্তু গুণ, ভাগ বা আরও জটিল কিছু জানত না। এ রকম আরেকটু উন্নত গণিত এবং প্রথম সংখ্যাব্যবস্থা দেখা যায় প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতায়, খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের দিকে।

তন্বী বলল, 'সুমেরুতে? খুব ঠান্ডা জায়গা, না ভাইয়া? পৃথিবীর একেবারে উত্তরে?

সুমার কি সুমেরুতে? তূর্য ভাইয়া শব্দ করে হেসে ফেলল, 'না, সুমেরু আর সুমার এক না। সুমার হলো এখন যেখান ইরাক, অনেকটা সেখানে। ওখানেই ছিল পৃথিবীর প্রথম নগর সভ্যতা, ওই এলাকাতেই জন্ম সংখ্যাতত্ত্ব আর পাটিগণিতের। দজলা-ফোরাত নদীর তীরের ওই অঞ্চলটা, যাকে আধুনিক ইতিহাসবিদেরা বলেন 'মেসোপটেমিয়া'— পৃথিবীর প্রথম গণিত বিকশিত হয়েছিল সেখানেই! সুমেরীয় সভ্যতা ধ্বংস হওয়ার পর কাছাকাছি এলাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয় অ্যাকাডীয় সভ্যতা, অ্যাসিরীয় সভ্যতা। আরেকটু পরে ওখানেই প্রতিষ্ঠা হয় আর একটা সভ্যতার, যার ব্যাপ্তি ছিল অল্প— কিন্তু খ্যাতি সবচেয়ে বেশি। তোমরা হয়তো নাম শুনে থাকবে— ব্যাবিলন!

তন্বী বলল, ও আচ্ছা, ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যানের গল্প শুনেছি। রাজা নেবুচাদনেজার নাকি একটা প্রাসাদ বানিয়েছিলেন রানিকে খুশি করতে। রানির দেশের বাড়ি ছিল সবুজ পাহাড়-উপত্যকাময় আর ব্যাবিলন ছিল রুক্ষ শুষ্ক। তখন রাজা ভেবেছিলেন ব্যাবিলনেই পাহাড়সমান একটা সবুজ বাগান করে দেবেন। মাটির অত ওপরে বাগান, সেটা দেখে লোকে ভাবত শূন্যে ঝুলছে উদ্যান।

৬০ মিনিটে ১ ঘন্টা, ১২ বছরে ১ যুগ। কেন ৬০, কেন ১২? কেন ২৫ বা ২৬ নয়?

হ্যাঁ। তবে ওই বাগান ছাড়া আরও অনেক কারণে পৃথিবী ব্যাবিলনের কাছে ঋণী। এই যে আমরা বলি, ৬০ সেকেন্ডে ১ মিনিট। ৬০ মিনিটে এক ঘণ্টা, ১২ বছরে ১ যুগ— অমন ৬০, ১২ এই সংখ্যাগুলো কোত্থেকে এল, জানো?

বান্টি বলল, এইটা আমারও প্রশ্ন। কেন ১২, কেন ৬০? কেন ২৫ না, ২৬ না।

তূর্য জানিয়ে দিল প্রশ্নটার উত্তর শতভাগ নিশ্চিত করে জানা নেই, তবে অধিকাংশ ইতিহাসবিদ মনে করেন এর কারণটা প্রাচীন গণনাপদ্ধতির মধ্যে নিহিত।

'৬০-ভিত্তিক সংখ্যাব্যবস্থা প্রথম দেখা গিয়েছিল প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতায়। এরপর ব্যাবিলনীয় সভ্যতাতেও এর দেখা মেলে। ওরা যেভাবে গুনত— সেটা দেখলেই বোঝা যায় ১২-এর ব্যাপারটা। (এখনো পৃথিবীতে অনেক জায়গায় এভাবে গোনার চল রয়ে গেছে)। এবার দেখি সেই গোনার উপায়টা।

আমরা হাতের আঙুলের কর গুনি, ওরা গুনত দুইটা করের মাঝখানের জায়গা বা আরও ভালো করে বললে আঙুলের হাড়! একটু তাকালেই দেখা যাবে বুড়ো আঙুল বাদে প্রতিটা আঙুলে ছোট ছোট তিনটা করে হাড় আছে। আমরা যেভাবে বুড়ো আঙুলের মাথা দিয়ে গুনি, ওরাও বুড়ো আঙুলকে একইভাবে ব্যবহার করত গোনার নির্দেশক হিসেবে। বুড়ো আঙুল বাদ দিলে বাকি থাকল চারটে আঙুল, প্রতিটায় তিনটে করে হাড়। এই মোট ১২টা।

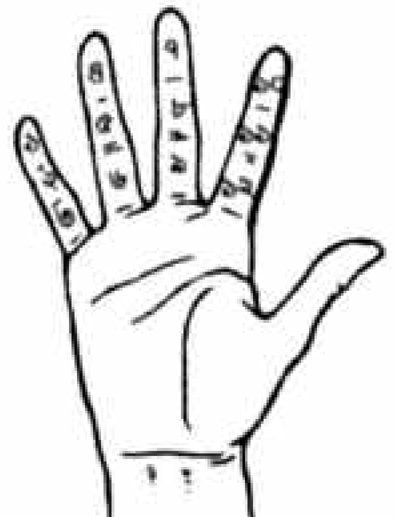

ডানহাতে এভাবে ১ থেকে ১২ পর্যন্ত গোনা হতো

ওরা গোনা শুরু করত ডান হাতের বুড়ো আঙুলের মাথাটা ওই হাতেরই কড়ে আঙুলের ওপরের ভাগে রেখে, এরপর ছবির মতন নিচে নামত, তারপর পাশের আঙুলে যেত। এক হাত দিয়ে ওরা সর্বোচ্চ ১২টা পর্যন্ত গুনতে পারত।

টিনা বলল, আমরা মনে হয় আরেকটু বুদ্ধিমান। আমরা তো এক হাতেই কর গুনে গুনে ২০ পর্যন্ত গুনতে পারি!

তূর্য হেসে বলল, হতে পারে। তবে মনে রেখো এটা এখন থেকে পাঁচ

হাজার বছর আগের ব্যাপার! যাহোক, অধিকাংশ ইতিহাসবিদ মনে করেন ওখান থেকেই এসেছে ১২-এর ব্যাপারটা। এরপর সে একটা ছবি এঁকে দেখাল।

পৃথ্বী হাঁ করে শুনছিল, সে অবাক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, এ তো গেল ১২। আর ৬০ কোত্থেকে এল?

এটা বুঝতে ডান হাতের সাথে সাথে এবার বাম হাতও লাগবে! ডান হাত দিয়ে তো ১২ পর্যন্ত গোনা হলো। এই ১২ গোনা শেষ হলে তারা অন্য হাতের মানে বামহাতের একটা আঙুল বন্ধ করত।

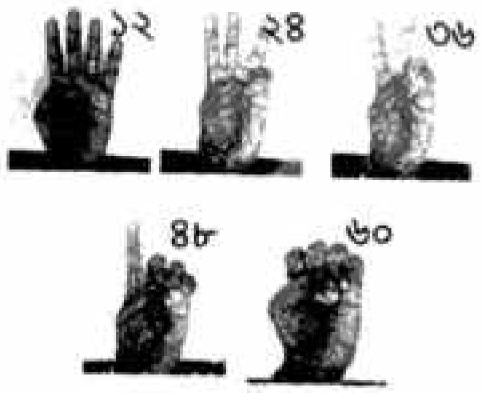

বামহাতের ক্ষেত্রে কতগুলো আঙুল বন্ধ সেটাই মুখ্য। তিনটা আঙুল বন্ধ মানে ১২ × ৩=৩৬ বোঝাবে

তূর্য ডান হাত দিয়ে ১২ পর্যন্ত গুনে বাম হাতের কড়ে আঙুল ভাঁজ করল। এরপর আবার ডান হাত দিয়ে আরও ১২টা গুনল। গোনা শেষ হলে বাম হাতের কড়ে আঙুল বন্ধ করল। এভাবে ডান হাতে ১২টা গোনে আর গোনা শেষ হলে বাম হাতের একটা করে আঙুল বন্ধ করে। এমন করে যখন বাম হাতের পাঁচটা আঙুলই বন্ধ হয়ে গেল, তখন সবাইকে বলল, তাহলে তোমরা বলো তো মোট কতগুলো গোনা হলো?

বান্টি বলল, একটা আঙুল ভাঁজ করলে গোনা হয় ১২, তাহলে পাঁচটা আঙুল ভাঁজ করলে হবে পাঁচ বারোং ষাট!

ঠিক তা-ই! এভাবেই এল ৬০।

পৃথ্বী হাঁ করে বলল, কী সাংঘাতিক!

বৃত্ত কেন ৩৬০ ডিগ্রি?

তূর্য পৃথ্বীর হাঁ-এর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। বলল, আর তোমরা কী জানো, বৃত্ত ৩৬০ ডিগ্রি কেন?

সবাই মাথা নাড়ল, কেউই জানে না। তূর্য বলল, এটার দুই রকম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, দুটোই ব্যাবিলনীয়দের এই ৬০ ভিত্তিক সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে।

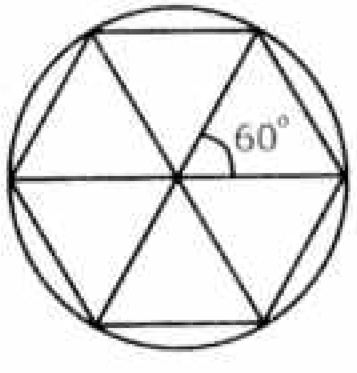

বলা হয় যে সুমার অঞ্চলের মানুষেরাই প্রথম আবিষ্কার করেছিল কীভাবে লিখতে হয়। সেটা পরবর্তীতে ব্যাবিলনের সভ্যতার মাঝেও চলে এসেছে। সেই প্রাচীন ব্যাবিলনের একটা কাদামাটির ফলক আবিষ্কৃত হয় ১৯৫০ সালের দিকে। সেখানে দেখা যায় তারা হিসাব করে দেখিয়েছে একটা বৃত্তের পরিধি আর এর মাঝে একটা ষড়ভুজ আঁকা, তাহলে তার পরিসীমার অনুপাত হবে $\frac{৫৭}{৬০} + \frac{৩৬}{৬০^{২}}$। তো সম ষড়ভুজকে ছয়টা সমবাহু ত্রিভুজে ভাগ করা যায়। ধারণা করা হয়, সমবাহু ত্রিভুজের একেকটা কোণকে ওরা ৬০ ডিগ্রি করে ভেবেছে। এটাকে কোণ মাপার একক চিন্তা করেছে। এরপর ৬টা সমবাহু ত্রিভুজ মিলে একটা ষড়ভুজ। একটা ষড়ভুজে কেন্দ্রে সবকোণ মিলে হবে ৬×৬০=৩৬০ ডিগ্রি।

আবার আরেকটা ব্যাখ্যা হলো চাঁদ-সূর্যের হিসাব।

তোমরা সবাই ইংরেজি Month শব্দটা জানো। th দিয়ে সাধারণত Noun বোঝায়, Noun-এর Suffix এটা। আর Mon অংশটি আসলে Moon-এর সাথে সম্পর্কিত। আমরা জানি Monday বলে একটা ব্যাপার আছে, আমরা বাংলায় বলি সোমবার— বাংলায় সোম শব্দটির অর্থও কিন্তু চাঁদ।

তো যা-ই হোক এই Month শব্দটির সাথে চাঁদের একটি সম্পর্ক আছে এবং ব্যাবিলনের জ্যোতির্বিদেরা খেয়াল করেছিলেন যে চাঁদ একটা দশা থেকে আর একটা দশায় ফিরে আসতে মোটামুটি ৩০ দিনের মতো লাগে। মনে করো, একটা পূর্ণিমা থেকে আবার ঘুরে ঘুরে পূর্ণিমা হলো। এটা হতে মোটামুটি সময় লাগে ৩০ দিনের মতো। এই ৩০ দিন সময়টাকে তারা একটা নাম দিয়েছিল ১ মাস বা 1 Month।

এখন আমরা জানি যে এটা আসলে ঠিক ৩০ দিন না। এটা ২৯.৫ দিনের মত। তখনকার দিনের মানুষের হিসাবে ছিল এটা ৩০ দিন।

এবং তারপর তারা খেয়াল করেছিল একটা ঋতু আবার একই ঋতুতে ফিরে আসতে প্রায় ১২ মাসের মত সময় লাগে। সে সময় তারা কিন্তু জানত পৃথিবীর চারপাশে সূর্য ঘোরে। তার মানে তারা ভেবেছিল সূর্যটা পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে আসতে সময় লাগে ১২ মাসের মত। এটা একটা চক্রের মতো। ৩০ দিনে মাস, ১২ মাসে বছর। তাহলে বছরের চক্র হয় ১২×৩০=৩৬০ দিনে। বছর যে আসলে ৩৬৫ দিনে হয়, সেটা তখনো ওরা জানত না। তবু জ্যোতির্বিদ্যার কোনো রকম আধুনিক জ্ঞান কিংবা যন্ত্রপাতি ছাড়াই ওরা যে ৩৬০ দিনে একটা চক্র হিসাব করেছিল, সেটা কিন্তু যথেষ্ট কাছাকাছি।

এই চক্রকে জ্যামিতিকভাবে আঁকার উপায় ছিল বৃত্ত দিয়ে বোঝানো। ফলে বছরকে ভাবল বৃত্ত, একেকটা দিন তার একেকটা ভাগ। তাই বৃত্তটাকে ওরা ৩৬০ ভাগে ভাগ করেছিল। অনেক পরে ওটার নাম দেওয়া হয় ডিগ্রি।

শূন্য ধনাত্মক না কি ঋণাত্মক?

বৃত্ত দেখতে দেখতে শূন্যের কথা মনে পড়ে বান্টির, শূন্য নিয়ে ওর কিছু সংশয় আছে। ও তূর্যকে প্রশ্ন করে, ভাইয়া, একটু অন্য প্রসঙ্গে যাই। আচ্ছা ভাইয়া, এই যে শূন্য, এটা কি ধনাত্মক নাকি ঋণাত্মক?

তূর্য একটু ঘুরিয়ে বলল, চিহ্ন অনুসারে বাস্তব সংখ্যা তিন প্রকার— ধনাত্মক, শূন্য ও ঋণাত্মক।

ও, তার মানে এটা ধনাত্মকও না, ঋণাত্মকও না?

ঠিক তাই। শূন্য একাই একটা প্রকার। অঋণাত্মকের মাঝে রাখতে পারো। অধনাত্মকের ভেতরেও রাখতে পারো!

শূন্য জোড় না কি বিজোড়?

এবার একটু সাহস হলো টিনার, আর ভাইয়া, ০ কি জোড় না বিজোড়? হুমায়ূন আহমেদের এক নাটকে দেখেছিলাম, এক মাস্টার বলে শূন্য হলো বিজোড়।

বলো কী, কোন নাটকে? আচ্ছা সেটা ব্যাপার না। আসল কথা হলো শূন্য একটা জোড় সংখ্যা। জোড় কারা সেটা ভাবো, যাদের দুই দিয়ে নিঃশেষে ভাগ করা যায়। শূন্যকে দুই দিয়ে নিঃশেষে ভাগ করা যায়। কল্পনা করতে পারো এভাবে, শূন্যটা আপেল দুজনকে সমানভাবে ভাগ করে দিলে। দুজনেরই থাকল শূন্যটা করে আপেল!

কিন্তু ভাইয়া, শূন্য তো ১ দিয়েও বিভাজ্য, ৩ দিয়েও বিভাজ্য। তাহলে কি সেদিক থেকে দেখলে এটা বিজোড়?

তূর্য পরিষ্কার করল, নাহ। জোড়া বা parity-র হিসাব হয় দুটো দুটো করে। এক জোড়া স্যান্ডেল মানে ঠিক দুইটা স্যান্ডেল, একটাও না, তিনটাও না। তাই এখানে দুই ব্যাপারটা দরকারি। জোড়, বিজোড় নির্ধারণে আর কোনো সংখ্যা নয়; বরং দুই দিয়ে নিঃশেষে ভাগ যায় কি না, সেটাই মুখ্য। অন্য কিছু দিয়ে নিঃশেষে ভাগ গেল কি গেল না, ব্যাপার না।

আরও অনেকভাবে শূন্য যে জোড় সেই ব্যাপারটাকে অনুভব করা যায়— পূর্ণসংখ্যাগুলোর দিকে তাকাও। ১, ২, ৩, ৪,...। এখানে দেখবে একটা জোড়, একটা বিজোড়। উল্টো করে দেখো ৩ বিজোড়, ২ জোড়, ১ বিজোড়, তাহলে এর আগেরটা মানে শূন্য হবে জোড়, শূন্য এর আগে -১ বিজোড়, -২ জোড়।

পৃথ্বী বলল, ও, ঋণাত্মক সংখ্যারও যে জোড়-বিজোড় হয়, জানতাম না। তূর্য হাসল, হ্যাঁ, হয়!

শূন্য দিয়ে ভাগ করলে কেন ওই সংখ্যাটাই পাওয়া যায় না?

তন্বী এবার বলল, শূন্যের একটা ব্যাপার আমি বুঝি না। আমার শুধু মনে হয়, কোনো কিছুকে ০ দিয়ে ভাগ করলে তো ওই সংখ্যাটাই আসা উচিত! কোনো সংখ্যাকে ২ দিয়ে ভাগ করা মানে সংখ্যাটাকে দুই ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তাহলে ০ দিয়ে ভাগ মানে বোঝায় ওই সংখ্যাকে ভাগই করা হয়নি। ভাগ যদি না-ই করা হয় তাহলে যা ছিল তা-ই থাকবে। এই চিন্তায় ভুল কই?

তূর্য বলল, আমিও তো এভাবে ভাবি নাই কখনো! আসলে পড়াতে গেলে এ রকম দারুণ সব প্রশ্ন পাওয়া যায়! তোমরা যা শেখো, তার থেকে আমিই বেশি শিখি। যাহোক, তোমার প্রশ্নে আসি। এখানে চিন্তার একটা ব্যাপার আছে। ধরো, তোমার কাছে ১২ টাকা আছে। এটা তুমি

কত করে পাবে? তুমি টুস করে বলে দেবে, প্রত্যেকে চারটে করে পাবে। গণিতের ভাষায় এটাকে আমরা বলছি ১২ ভাগ ৩ = ৪।

খেয়াল করো, তোমার কাছে কী আছে, সেটা কিন্তু ভাগফল না। যাদের দিচ্ছ, তারা প্রত্যেকে কত করে পাচ্ছে সেটা ভাগফল। তুমি যদি ওই ১২ টাকা ২ জনকে দাও, তাহলে ওই দুজনের প্রত্যেকের কাছে ৬ টাকা থাকল। ১২÷২=৬। ব্যাপারটা অনেকটা এ রকম যে তুমি টাকাটা ঠিকমতো বিতরণ করছ কি না, সেটা তোমার থেকে খোঁজ নেওয়া হবে না, যাদের দিচ্ছ তাদের থেকে খোঁজ নেওয়া হবে। এখন তুমি শূন্যজনকে ভাগ করে দাও, মানে কাউকে দিলে না। এবারে আমি খোঁজ নিতে গেলাম তাদের কাছে, যারা টাকাটা পেয়েছে। তুমি যেহেতু কাউকে দাওনি, আমি কার থেকে খোঁজ নেব? 'প্রত্যেকে কত করে পেয়েছে' এই প্রশ্নটা তখন কোনো অর্থ বহন করবে না। ১২÷০ অসংজ্ঞায়িত।

শূন্য দিয়ে ভাগ করার আরেক সমস্যা

আরেকভাবে চিন্তা করো। মনে করো, একটা বালতিতে ১২ লিটার পানি আটে। আর একটা মগে ৩ লিটার পানি আটে। তাহলে মগ দিয়ে সব পানি তুলে ফেলতে চাইলে ৪ বার তুলতে হবে। ১২ ভাগ ৩ = ৪। ভাগকে এভাবে বোঝার চেষ্টা করি।

ঠিক একইভাবে, বালতিতে যদি ১২ লিটার পানি আটে আর মগে ২ লিটার, তাহলে সব পানি ওঠাতে চাইলে পানি তুলতে হবে ১২ ভাগ ২= ৬ বার।

এবার ভাবো, বালতিতে যদি ১২ লিটার পানি থাকে, আর মগে যদি পানিই না আটে (মগের তলা পুরো ফাঁকা!) অর্থাৎ মগে যদি ০ লিটার পানি আটে, তাহলে ওই মগ দিয়ে সব পানি ওঠাতে চাইলে পানি তুলতে হবে কত বার? ১২ ভাগ ০ বার!!

অমন মগে কি আদৌ পানি ওঠানো যাবে? যাবে না! এবং ১২ ভাগ ০-এর মানও পাওয়া যাবে না। সবার চোখ দেখে মনে হলো এবার তারা কিছুটা বুঝেছে।

টিনা বলল, ভাইয়া, ভাগ নিয়ে যখন বলছেন, এখানে আমার একটা জিনিস জানার ছিল। ভাগ নাকি বিয়োগের সংক্ষিপ্ত রূপ! এটা কীভাবে?

তূর্য বলল, আচ্ছা, আবার চলো মগ আর বালতির কাছে যাই। আগের মতই মনে করো, একটা বালতিতে ১২ লিটার পানি আটে। আর একটা মগে ৩ লিটার পানি আটে। তাহলে মগ দিয়ে সব পানি তুলে ফেলতে চাইলে কতবার তুলতে হবে? ৪ বার। এটাকে ভাগ দিয়ে ভাবতে পারো, বিয়োগ দিয়েও ভাবতে পারো। ১২ লিটার থেকে প্রথমে ৩ লিটার তুললে, থাকল ১২-৩=৯; এই ৯ লিটার থেকে ৩ লিটার তুললে, থাকল ৯-৩=৬; সেই ছয় থেকে তিন তুললে, থাকল ৬-৩=৩, সেই ৩ থেকে ৩ তুললে, থাকল ০, সব পানি শেষ। তার মানে ১২ থেকে ৩ বিয়োগ দিয়ে শূন্য বানাতে হলে কতবার বিয়োগ করতে হবে? চারবার। এটাই ১২÷৩=৪; তবে এখানে বলে রাখি যোগ থেকে গুণ বা বিয়োগ থেকে ভাগের এই ধারণাগুলো শুরুর জন্য ভালো, কিন্তু জটিল সংখ্যা, অমূলদ সংখ্যা—এসব ক্ষেত্রে সরাসরি এই চিন্তাগুলো আর কাজ করে না। তখন নতুন করে ভাবতে শিখতে হয়! সেটাও সময় পেলে তোমাদের বলব।

ঋণাত্মক সংখ্যার কী দরকার ছিল?

টিনা বলল, ভাইয়া, কত রকমের সংখ্যার নাম বললেন। আমি তো ধনাত্মক-ঋণাত্মক সংখ্যার মতো সহজ ব্যাপারগুলোই গোলমাল পাকিয়ে ফেলি। শুধু মনে হয়, এই ঋণাত্মক সংখ্যার কি আদৌ কোনো দরকার আছে? মানে আমরা তো কখনো বলি না যে -১টি পেনসিল বা -২টি কমলা। তাহলে ঋণাত্মক সংখ্যার বাস্তব উদাহারণ কী হতে পারে?

তূর্য হেসে বলল, আমার ব্যাংক ব্যালান্স! আমার একটা অ্যাকাউন্টে ৩০ টাকা ছিল। জানতাম না যে ওখানে মাসিক ১০০ টাকা সার্ভিস চার্জ কেটে রাখে। হায় কপাল, মাস শেষে দেখলাম ব্যালান্স -৭০ টাকা, হা হা হা।

হাসল সবাই। কিন্তু টাকাপয়সা ছাড়া আর কোথাও কী কাজে লাগে?

এখন গুগলে খুঁজে দেখতে পারো এভারেস্টের চূড়ায় তাপমাত্রা কত!

পাবে -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তারও কম! এই তাপমাত্রা ঋণাত্মক এবং বাস্তব!

বাংলাদেশে ২০১৬-তে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১.১%, মানে জনসংখ্যা বাড়ছে! জাপানে সেটা -০.১ % মানে জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে! এই ঋণাত্মক সংখ্যাটা ওদের বিরাট বাস্তব সমস্যা!

এগুলো সামান্য উদাহরণ মাত্র! মূল ব্যাপারটা হলো 'আদর্শ বা মূলবিন্দু'! পৃথিবীতে কোনো হিসাবই পরম হিসাব না! কোনো একটাকে মূল ধরে তার সাপেক্ষে সবকিছু আমরা হিসাব করি! পানির হিমাঙ্ককে ০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা আদর্শ ধরে নিলে তার চেয়ে বেশিগুলোকে ধনাত্মক আর তার থেকে ছোটগুলোকে ঋণাত্মক বলি আমরা! হিমাঙ্ককে ০ ধরি, তখন স্ফুটনাঙ্ক হয় ১০০ ডিগ্রি। আমরা চাইলে পানির স্ফুটনাঙ্ককেও ০ ধরতে পারতাম, তখন পানির হিমাঙ্ক হতো -১০০ ডিগ্রি! ঋণাত্মক সংখ্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, এটা আমাদের যেকোনো জায়গাকে মূলবিন্দু ভাবার এই স্বাধীনতাটা দেয়।

ঋণাত্মক সংখ্যার লসাগু গসাগু কেমন হয়?

টিনা বুঝতে পারল, ঋণাত্মক সংখ্যার আসলে দরকার আছে। পৃথ্বী অবাক হয়ে শুনছিল, ওর মনে পড়ল, ক্লাসে একবার নজিবুল্লাহ স্যার একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ১৫ আর -১২ এর লসাগু কত, বলাই বাহুল্য ছেলেটা পারেনি। আশ্চর্য কথা হলো স্যার শুধু জিজ্ঞেস করেই খালাস, উত্তরটা আর বুঝিয়ে দেননি। এখন সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞেস করল তূর্যকে। ভাইয়া, ঋণাত্মক সংখ্যার লসাগু গসাগু কেমন হয়?

সবাই এক ঝটকায় তাকাল পৃথ্বীর দিকে, সবার মনে পড়ে গেছে নজিবুল্লাহ স্যারের ওই দিনের ঘটনার কথা। এখানে কেন তার কথা মনে করিস! বিরক্তি সামলে পৃথ্বী বলল, আর ভাইয়া, যদি কোনো একটা সংখ্যা শূন্য হয়, তখন লসাগু গসাগু কেমন হয়?

তূর্য বলল, তোমাদের নজিবুল্লাহ মাস্টার চরিত্রটা ইন্টারেস্টিং! যাহোক, তোমাদের প্রশ্নে আসি। এটা নিয়ে ছোটবেলায় আমার নিজেরও দ্বিধা ছিল, এখন নেই। ঋণাত্মকের ক্ষেত্রে মূল কথা হলো, **মাইনাস চিহ্ন বাদ দিয়ে ভাববে**— ব্যস, ঝামেলা শেষ!

ধরো, তোমায় কেউ জিজ্ঞেস করল ১২ এবং -১৬-এর লসাগু বা গসাগু কত? ১৬-এর আগের ঋণাত্মক চিহ্ন দেখে মোটেই ঘাবড়ে যাবে না। জেনে রেখো, লসাগু বা গসাগু এমনভাবে সংজ্ঞায়িত যে, এরা কখনো ঋণাত্মক হয় না। ঋণাত্মক চিহ্নটা বাদ দিয়ে চিন্তা করলেই চলবে। মানে হলো ১২ আর ১৬-এর গসাগু যা, ১২ আর -১৬-এর গসাগুও তাই, -১২ আর ১৬-এর গসাগুও একই, -১২ আর -১৬-এর গসাগুও ওই একই। এদের সবারই গসাগু ৪। লসাগুর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একইরকম, সবক্ষেত্রেই লসাগু হবে ৪৮। ঋণাত্মক চিহ্ন বাদ দিয়ে ভাবলেই ঝামেলা শেষ।

কেন, ভাইয়া?

বোঝাচ্ছি। প্রথমে গসাগু বা গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়কের কথা ভাবো। দেখো, ১২-এর গুণনীয়কগুলো অর্থাৎ যেসব পূর্ণসংখ্যা দিয়ে ১২ নিঃশেষে বিভাজ্য তারা হলো ১, ২, ৩, ৪, ৬, ১২। কিন্তু ১২ সংখ্যাটা তো -১, -২, -৩ এই সব দিয়েও বিভাজ্য। তাই যদি ঋণাত্মক সংখ্যাদেরও রাখতে চাও তাহলে বলতে পারো ১২-এর গুণনীয়কগুলো হলো ±১, ±২, ±৩, ±৪, ±৬, ±১২। খেয়াল করে দেখো, -১২-এর গুণনীয়কও কিন্তু এরাই!

এভাবে ১৬ বা -১৬-এর গুণনীয়কগুলো হলো ±১, ±২, ±৪, ±৮, ±১৬। দুটোর ভেতরে যারা কমন বা সাধারণ তারা হলো ±১, ±২, ±৪। এদের মধ্যে গরিষ্ঠ বা সবচেয়ে বড় হলো ৪, তাই গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক হলো ৪। ঋণাত্মক চিহ্ন এখানে কোন ভূমিকা রাখে না।

লসাগুর ক্ষেত্রে সামান্য ঝামেলা আছে, কিন্তু সেটা এড়ানো যায়। আগের মতোই লক্ষ করো, ১২-এর গুণিতক যারা, -১২-এর গুণিতকও তারাই। ০, ±১২, ±২৪, ±৩৬, ±৪৮, ±৬০, ±৭২, ±৯৬ এমন করে অসীম সংখ্যক গুণিতক এদের আছে। অন্যদিকে ১৬ বা -১৬-এর গুণিতক হবে ০, ±১৬, ±৩২, ±৪৮, ±৬৪, ±৮০, ±৯৬ এমন করে অনেকে। তো

১২ আর ১৬-এর গুণিতকদের ভেতরে কমন বা সাধারণ আছে কারা? ০, ±৪৮, ±৯৬ ইত্যাদি। এদের মধ্যে লঘিষ্ঠ কে?

ঋণাত্মককে নিতে গেলে বিপদ, কারণ -৪৮-এর চেয়ে -৯৬ ছোট। আরও পেছনে গেলে -১৪৪ পাওয়া যাবে যা ১৬ এবং ১২ দুইয়েরই গুণিতক। সেটা - ৯৬-এর চেয়েও ছোট। আরও বামে গেলে -১৯২ পাওয়া যাবে, সেটা আরও ছোট, এমন করে আরও ছোট সাধারণ গুণিতক আমরা পেতেই থাকব। সব থেকে ছোট যে কোনটা, তার কোনো কূল-কিনারা পাওয়া যাবে না। আবার দুটো অশূন্য সংখ্যার লসাগু শূন্য হলে ঝামেলা, তাহলে দুনিয়ার সব লসাগুর মান হবে ০। কারণ শূন্য তো সবার গুণিতক, সব জায়গাতেই থাকবে। তাই লসাগুকে সুসংজ্ঞায়িত করার জন্য, সাধারণ গুণিতকগুলোর ভেতরে সব থেকে ছোট 'ধনাত্মক' মানটাকে লসাগু ধরা হবে। যেমন এ ক্ষেত্রে লসাগু হলো ৪৮।

একটা সংখ্যা শূন্য থাকলে লসাগু গসাগু কেমন হয়?

এবারে ধরো যদি দুটো সংখ্যার মধ্যে একটা শূন্য হয়, তখন কী হবে? তখন লসাগু হবে ০। তার কারণটা বোঝাই। ধরো আমরা -৬ ও ০-এর লসাগু বের করতে চাই। -৬-এর গুণিতক কারা? ০, ±৬, ±১২, ±২৪ এমন করে অনেকে। আর ০ এর গুণিতক কারা? ০ এর ঘরের নামতা ভাবো। ০ এক্কে ০, ০ দুগুণে ০, ০ তিরিক্কে ০। তার মানে ০ এর গুণিতক আছেই একটা, সেটা হলো ০। তাই ৬ আর ০ এর গুণিতকদের ভেতরে কমন আছে একটা, সেটা হলো ০। এখন কথা হলো পরিবারে একটামাত্র ছেলে থাকলে, সে-ই পরিবারের সবচেয়ে 'বড় ছেলে', সে-ই সবচেয়ে ছোট। তাই -৬ ও ০-এর লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক হবে ০।

গসাগুর ক্ষেত্রে কী হবে? যদি দুটো সংখ্যার মধ্যে একটা ০ (শূন্য) হয়, তাহলে গসাগু হবে ০ বাদে বাকি সংখ্যাটার পরমমান। এটাও সহজে ভাবা যায়। ধরো, -৬ ও ০-এর গসাগু বের করতে চাই। ৬ বা -৬-এর গুণনীয়ক হলো ±১, ±২, ±৩, ±৬। অন্যদিকে ০ এর গুণনীয়ক তো শূন্য বাদে দুনিয়ার সব পূর্ণসংখ্যা : ±১, ±২, ±৩, ±৪, ±৫, ±৬, ±৭...। এদের ভেতরে কমন বা সাধারণ হলো ±১, ±২, ±৩, ±৬। তাহলে ০ আর -৬-এর সাধারণ গুণনীয়কদের ভেতরে সবচেয়ে বড় বা গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক হবে ৬। অর্থাৎ মানে ০ বাদে বাকি সংখ্যাটার পরমমান।

দুটো সংখ্যাই যদি শূন্য হয়, লসাগুও ০, গসাগুও ০।

গসাগুকে ইংরেজিতে GCD (Greatest Common Divisor) বলে, আর লসাগুকে বলে LCM (Least Common Multiple)। ধরো a, b দুটো পূর্ণসংখ্যা। এদের গসাগুকে লেখা যায় GCD(a, b), আর লসাগুকে লেখা যায় LCM (a, b) এতক্ষণ যা বললাম, তার সারমর্ম এভাবে লেখা যায়—

$$\mathrm{GCD}(a,b)=\mathrm{GCD}(|a|,|b|)$$

$$\mathrm{GCD}(a,0)=|a|$$
$$\mathrm{GCD}\ (0,0)=0$$

$$\mathrm{LCM}(a,b)=\mathrm{LCM}(|a|,|b|)$$
$$\mathrm{LCM}(a,0)=0$$
$$\mathrm{LCM}(0,0)=0$$

আরেকটা ব্যাপার তোমরা হয়তো শুনেছ, দুটো সংখ্যার লসাগু ও গসাগুর গুণফল সংখ্যা দুটোর গুণফলের সমান হয়। ঋণাত্মক সংখ্যা চিন্তা করলে বলা উচিত লসাগু-গসাগুর গুণফল সংখ্যা দুটোর গুণফলের 'পরমমানের' সমান হয়

$$\mathrm{GCD}(a,b) \times \mathrm{LCM}(a,b) = |ab|$$

০ আর ০-এর গসাগুর ক্ষেত্রে ঝামেলা কোথায়?

টিনা জিজ্ঞেস করল, ভাইয়া, ০ এবং ০-এর গসাগু কেন ০ হবে?

এটা আসলেই একটা চিন্তার বিষয়। যেহেতু সব পূর্ণসংখ্যা দিয়েই শূন্যকে নিঃশেষে ভাগ করা যায়, ০ এর গুণনীয়ক হবে সব পূর্ণসংখ্যা : ১, -১, ২, -২, ৩, -৩... ইত্যাদি। দুটো সংখ্যাই যদি ০ হয়, তখন কমনও থাকবে সবগুলো। মানে সাধারণ গুণনীয়কও হবে সব পূর্ণসংখ্যা। এদের ভেতরে গরিষ্ঠ নিতে গেলে আমরা কোনটা নেব? তখন অসীমের

মতো unbounded একটা মান পাব।

এ রকম ক্ষেত্রগুলোতে যেটা করা হয় তা হলো, ভিন্নভাবে চিন্তা করে এমন কোনো মান ঠিক করে দেওয়া হয়, যেন অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ঠিক থাকে। যেমন গসাগুর একটা বৈশিষ্ট্য হলো $\text{GCD}(ma,mb)=|m|.\text{GCD}(a,b)$; অর্থাৎ দুটো সংখ্যাকে m গুণ বাড়ালে এদের গসাগুও m গুণ হয়ে যাবে, যেখানে m পূর্ণসংখ্যা। যেমন $\text{GCD}(3\times5,6\times5)=5\times\text{GCD}(3,6)$। এখন এখানে m-এর মান যদি ০ চিন্তা করা যায়, আমরা পাব $\text{GCD}(0\times a,0\times b)= 0\times\text{GCD}(a, b)$, বা $\text{GCD}(0,0)=0$। অর্থাৎ শূন্য এবং শূন্যের গসাগু হলো শূন্য।

আরেকটা বৈশিষ্ট্য আমরা একটু আগে দেখেছি, $\text{GCD}(a,0)=|a|$, এখানেও a-এর মান শূন্য হলে পাব— $\text{GCD}(0,0)=0$। $\text{GCD}(0,0)$-এর আর কোনো মানের জন্য এই বৈশিষ্ট্যগুলো ঠিক থাকবে না। এ জন্য সংজ্ঞাতেই $\text{GCD}(0,0)=0$ ধরে নেওয়া হয়।

লসাগুর মূল ঘটনাটা কী?

টিনা একটু কাচুমাচু করে বলল, ভাইয়া, লসাগুর ব্যাখ্যাটা আবার একটু বোঝাবেন...।

তূর্য বলল, অবশ্যই। আমি খুব খুশি হয়েছি তুমি যে আবার জিজ্ঞেস করেছ। আমি যা বলছি তার সব কথা তুমি বুঝবেই এটা আমি আশা করি না। না না, এটা তোমার দুর্বলতা না। আমি হয়তো সেভাবে উপস্থাপন করতে পারিনি, যেভাবে বললে তুমি বুঝতে।

১৬ আর -১২-এর কথা আবার ভাবো! এদের সাধারণ গুণিতক হলো ০, ৪৮, -৪৮, ৯৬, -৯৬, ১৪৪, -১৪৪, ১৯২, -১৯২ এমন করে চলতেই থাকবে! এখন এদের ভেতরে সবচেয়ে ছোট কে?

টিনা বলল, -১৯২।

গুড। এখন খেয়াল করো, আমি বলেছি 'এমন করে চলতেই থাকবে', তার মানে -১৯২তেই শেষ নয়। আরও পেছালে -২৪০ পাবে, সেটাও ১৬ এবং -১২-এর গুণিতক। আরও পেছালে -২৮৮ পাবে, আরও গেলে -৩৩৬ পাবে। তারাও ১৬ এবং -১২-এর গুণিতক। এমন করে আমরা

অনন্তকাল ধরে পেছাতে পারব। তাহলে সবচেয়ে ছোট কে, সেটা কি এ ক্ষেত্রে বলা সম্ভব? না। সে ক্ষেত্রে সাধারণ গুণিতকদের ভেতরে (০ বাদে বাকিদের ভেতরে) যার পরমমান সবচেয়ে ছোট, তাকেই লসাগু হিসেবে নেওয়া হয়।

তবে লসাগু জিনিসটা কী, সেটাই চলো আরও ভালো করে বোঝাই। লসাগু কেন করছি আমরা? আমরা আসলে কী বের করতে চাই? একটা উদাহরণ দিই। ধরো, একটা ঘড়ি এমনভাবে সেট করা যেন সেটা ১২ মিনিট পরপর অ্যালার্ম দেয়। আরেকটা ঘড়ি ১৬ মিনিট পরপর অ্যালার্ম দেয়। তুমি একবার খেয়াল করলে তারা একসাথে অ্যালার্ম দিল। এখন তুমি কি বলতে পারবে আবার কখন তারা একসাথে অ্যালার্ম দেবে?

প্রথম ঘড়ি এরপর ১২ মিনিটে, তারপর ২৪, তারপর ৩৬, তারপর ৪৮, তারপর ৬০ মিনিটে অ্যালার্ম দেবে, এভাবে প্রতি ১২ মিনিট পরপর অ্যালার্ম দিতেই থাকবে। দ্বিতীয়টা এরপর ১৬, তারপর ৩২, তারপর ৪৮, তারপর ৬৪ তে অ্যালার্ম দেবে, এভাবে প্রতি ১৬ মিনিট পরপর অ্যালার্ম দিতেই থাকবে।

খেয়াল করো, দুইটাই একসাথে অ্যালার্ম দেবে ৪৮-এ গিয়ে। তাহলে তখন থেকে যদি আবার ভাবি নিশ্চয়ই আরও ৪৮ মিনিট পরে তারা আবার একসাথে অ্যালার্ম দেবে। তার মানে যখন তুমি ওদের একসাথে বাজতে দেখেছ, সেই শুরুর সময়ের ৪৮ মিনিটে একসাথে একবার দেবে, তারপর ৯৬ মিনিটে, তারপর আরও ৪৮ মিনিট পর, মানে ১৪৪ মিনিটে। এরপর ১৯২ মিনিটে, তারপর ২৪০-এ, ২৮৮-এ, এভাবে প্রতি ৪৮ মিনিট পরপর ওরা একসাথে বাজতে থাকবে (আশা করি ব্যাটারি টিকে থাকবে কিংবা সোলার প্যানেল বসানো ভাবতে পারো)। ভালো করে দেখো, যে সংখ্যাগুলো দেখছ এরা সবাই আসলে ৪৮-এর গুণিতক বা ৪৮-এর ঘরের নামতা। ৪৮-কে জানলেই এদের সবাইকে জানা যায়।

এবার ধরো, তুমি উল্টো করে ভাবছ। তুমি দেখলে এখন একবার একসাথে বাজল, তাহলে বলো তো এর আগে কখন একসাথে বেজেছিল? নিশ্চয়ই ৪৮ মিনিট আগে। শুরুর সময়কে ০ ধরলে ৪৮

মিনিট আগের সময়টাকে তুমি বলতে পারো -৪৮ মি.। তাহলে তার আগে কখন বেজেছিল? -৯৬-এ, তার আগে -১৪৪-এ...। ভালো করে দেখো এরাও কিন্তু ৪৮-এর গুণিতক। এবারে ফিল করার চেষ্টা করো, এই আলোচনায় ৪৮, ৯৬, ১৪৪, ১৯২ কিংবা -৪৮, -৯৬, -১৪৪, -১৯২ —এদের ভেতরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা কোনটা? কোন সংখ্যাটাকে জানলে তুমি বাকি সব সংখ্যা বের করে নিতে পারবে। কতক্ষণ পরপর ওরা একসাথে বাজে? কতক্ষণ আগে ওরা একসাথে বেজেছিল? বলো দেখি সেটা কত?

টিনার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবার। ও বলল, '৪৮'।

ঠিক তা-ই। এ জন্য ৪৮-কে লসাগু বললে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাই।

সহমৌলিক সংখ্যা কী?

ভাইয়া, গসাগুর কথায় মনে পড়ল, আমাদের বইয়ে এক জায়গায় আছে গসাগু ১ হলে সহমৌলিক বলে। ১-কে সহমৌলিক কেন বলল?

তূর্য বলল, না, না, ১ কে সহমৌলিক বলা হয় না! সহমৌলিক বা Coprime ব্যাপারটার জন্য দুইটা সংখ্যা লাগে! দুটো সংখ্যার গসাগু যদি ১ হয়, ওই দুটো সংখ্যা পরস্পর সহমৌলিক। যেমন ৫ আর ১২ সহমৌলিক! ৩ আর ৮ সহমৌলিক! সহমৌলিক হওয়া মানে সংখ্যা দুটোর ভেতর ১ ছাড়া আর কোনো সাধারণ গুণনীয়ক নেই! ১-এর সাথে সব পূর্ণসংখ্যাই সহমৌলিক। কারণ ১-এর সাথে সবার গসাগু ১।

মৌলিক সংখ্যা কী?

তন্বীকে একটু বিভ্রান্ত দেখাল, ১ সবার সাথে সহমৌলিক, কিন্তু ১ নিজে কি মৌলিক সংখ্যা?

তূর্য জোর দিয়ে জানাল, না, সহমৌলিক হওয়ার সাথে মৌলিক হওয়ার কোনো সম্পর্ক নাই। এবং তুমি শতভাগ ঠিক আছ— ১ কোনো মৌলিক সংখ্যা নয়। মৌলিক সংখ্যার সংজ্ঞাতেই বলে দেওয়া আছে মৌলিক সংখ্যা হবে ১-এর থেকে বড় পূর্ণসংখ্যা। আর তাদের উৎপাদক থাকবে দুইটা ১ এবং সেই সংখ্যা নিজেই।

১ কেন মৌলিক নয়?

১ কে যদিও আর ভাঙা যায় না, তবু ১-কে মৌলিক সংখ্যার ভেতরে রাখা হয়নি।

টিনার মনে হলো ১-এর জন্য খুব করুণা হচ্ছে, আহারে, ১-কে বাদ দিল কেন?

বান্টি ফিচকে হাসি দিল, নিশ্চয়ই ১-এর কোনো টাল্টি-বাল্টির ইতিহাস আছে!

ভাইয়াও হাসল, কথা খানিকটা সত্যি। ১-এর ঝামেলা আছে। মৌলিক সংখ্যার কী দরকার সেটা আগে বোঝো, তাহলে বোঝা সহজ হবে কেন ১-কে মৌলিক সংখ্যার মধ্য থেকে বাদ দেওয়া হলো।

বলো, রসায়নে পানির সংকেত কী? H_20। দেখো, এটার ভেতর দুইটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। কী কী মৌল আছে, আর প্রতিটা মৌল কতগুলো করে আছে। এদের কোনো একটা তথ্য বদলে গেলে এটা আর পানি থাকবে না। এই দেখো, H-এর মধ্যের ছোট অনুভূমিক দাগটাকে বদলে কোনাকুনি করে দিলে হয়ে যাবে N। পাবে N_20- লাফিং গ্যাস! অল্প নিলে ব্যথা ভুলে হাসতে থাকবে, বেশি নিলে হাসতে হাসতে হার্ট অ্যাটাক করে মরে যাবে। আবার H_20-এর অক্সিজেন একটা বাড়িয়ে দিলে হয়ে যাবে H_20_2, হাইড্রোজেন পার অক্সাইড। H_20-তে কাপড় পরিষ্কার হয় আর H_20_2 দিলে রংটং উঠে কাপড় নষ্ট হয়। তাই আবার বলছি, 'কী কী মৌল আছে আর প্রতিটা মৌল কতগুলো করে আছে'— দুটো তথ্যই খুব জরুরি।

এবার সংখ্যার ভেতরে ভাবো। ধরো ৪৫ সংখ্যাটার ভেতরে মৌলিক কারা আছে, তুমি বের করতে চাও। দেখবে একে দুইবার ৩ দিয়ে ভাগ করা যায় আর একবার ৫ দিয়ে। ৪৫=$৩^২$×৫। এর ভেতরে দুইটা ৩ আছে আর একটা ৫। খেয়াল করো, ৪৫-কে কিন্তু আর কোনো মৌলিক সংখ্যা দিয়ে লেখা যায় না। যেভাবেই মানুষ বের করতে চাক এখানে ঠিক দুইটাই ৩ পাবে এবং একটাই ৫ পাবে। এভাবে লেখাকে বলে মৌলিক সংখ্যার সূচকের গুণফল আকারে প্রকাশ বা prime power factorization।

সংখ্যাতত্ত্বের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা উপপাদ্য হলো, কোনো পূর্ণসংখ্যাকে অনন্য উপায়ে মানে শুধু একভাবে মৌলিক সংখ্যার সূচকের গুণফল আকারে লেখা যাবে। এটাকে বলে পাটিগণিতের মূল উপপাদ্য বা

Fundamental Theorem of Arithmatic। এই উপপাদ্যকে ব্যবহার করে আরও অজস্র উপপাদ্য প্রমাণ করা হয়েছে। এখন যদি ১-কে মৌলিক ধরা হয়, তাহলে এই যে বললাম 'শুধু একভাবে' প্রকাশ করা যায়— সেই ব্যাপারটা আর ঠিক থাকে না।

কেউ লিখবে $৪৫=১^{২}\times৩^{২}\times৫$। কেউ লিখতে পারে $৪৫=১^{৩}\times৩^{২}\times৫$, কেউ লিখতে পারে, $১^{২০০০০}\times৩^{২}\times৫$। সব ক্ষেত্রেই কিন্তু ৪৫ পাওয়া যাবে। কিন্তু অনন্যতার ব্যাপারটা থাকছে না, যেটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে সংখ্যাতত্ত্বের অতগুলো উপপাদ্য। আসলে ১ যতগুলো থাকুক কিছু যাবে-আসবে না। এটাকে আমি চিন্তা করি রসায়নে পানির অণুর ভেতরে থাকা শূন্যস্থানের মতো। হাইড্রোজেন দুইটা আর অক্সিজেন একটা ছাড়াও পানির অণুতে আছে শূন্যস্থান। শূন্যস্থান কয়টা আছে? একটা বললেও যা, দুইটাও তা, দুই শটাও তা। শূন্যের ওপরেই সব অবস্থান করে। শূন্যস্থান যে রকম অণু গঠনের শুরুর অবস্থা, গুণ আকারে লেখার ক্ষেত্রে সংখ্যার শুরুর অবস্থা হলো ১। ১ থেকে সব গুণ শুরু হয়, ১-কে বলে শূন্যতার গুণফল। এ কারণেই কোনো সংখ্যার পাওয়ার শূন্য হলে তার মান ১ হয়। তো, যতগুলোই ১ নাও, সংখ্যার মান অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু ওই যে বললাম, 'অনন্য উপায়ে বা ঠিক একভাবে প্রকাশ' করার যে উপপাদ্য ওটা আর তখন ঠিক থাকে না। ১-কে বাদ দিলেই ঝামেলা শেষ! এ কারণেই ১-কে মৌলিক সংখ্যায় রাখা হয় না।

তবে টিনা, তুমি দুঃখ পেয়ো না। ১-এর সম্মানও কম নয়! যেহেতু ১ কোনো মৌলিক সংখ্যা না, ১ কোনো যৌগিক সংখ্যা না, সে নিজেই একটা প্রকার। ১ হলো একক।

তূর্য সবার দিকে তাকাল, সংখ্যা নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন?

তন্বী অনেকক্ষণ ধরে তার খাতার ভেতর আঁকিবুঁকি করছিল। সে উদাস দৃষ্টিতে জিজ্ঞেস করল, সেদিন এক জায়গায় পড়লাম ফিবোনাচি ধারা বলে একটা বিষয় আছে, সেটা নাকি দারুণ রহস্যময়! ফিবোনাচি সিরিজের রহস্যটা কী? ফিবোনাচি সাহেবের মাথায় এই ধারাটার ধারণাটা এল কোথা থেকে।

ফিবোনাচি সিরিজ কোত্থেকে এল?

তূর্য বলল, 'দেখো, রহস্য বললে একটা ধোঁয়া ধোঁয়া ব্যাপার মনে হয়। এখানে অমন কিছু নাই। এটা গণিত, একেবারে পরিষ্কার! ধারাটার কথা আমি বলব—তার আগে মানুষটা নিয়ে একটু বলি। লিওনার্দো ফিবোনাচি ছিলেন একজন ইতালীয় গণিতবিদ। 'ফিবোনাচি' মানে হলো 'বোনাচির ছেলে'। আরবিতে 'অমুক বিন তমুক' বলে না? অনেকটা ওই রকম। তো ফিবোনাচি সাহেব একজন ব্যবসায়ীও ছিলেন। তিনি আরবে ব্যবসা করতে গিয়ে দেখেছিলেন ওখানে মানুষ ১০টা প্রতীক দিয়ে সবকিছু লিখে ফেলে, এখন যেভাবে আমরা লিখি আর কী। ওটা দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। কারণ তখনো ইউরোপের মানুষ রোমান সংখ্যা ব্যবহার করত, যেটা দিয়ে গুণ-ভাগ করা খুবই ঝামেলার। তিনি তার বই 'Liber Abaci'-তে লিখলেন ব্যাপারটা নিয়ে। তারপর সারা ইউরোপে এটা ছড়িয়ে পড়ল। এটা একটা বিরাট কাজ ছিল। এত বড় একটা কাজ করলেন তিনি অথচ মানুষ তাকে মনে রাখে শুধু এক ধারার জন্য!

যাহোক ধারাটা অবশ্য খুবই মজার। ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১... ১ আর ১ থেকে শুরু এরপর আগের দুইটা পদ যোগ করে পাওয়া যায় পরের পদটা। ১ আর ২ এ ৩; ২ আর ৩ এ ৫ এভাবে। ফিবোনাচি আবিষ্কারের আরও আগে থেকেই উপমহাদেশের গণিতবিদেরা এটা নিয়ে জানত। তবে যা হয় কী, একবার একটা নাম ছড়িয়ে গেলে সেটাই বিখ্যাত হয়ে যায়।

তো ফিবোনাচি এটা তৈরি করেছিলেন একটা মজার সমস্যা থেকে। সমস্যাটা ছিল এমন। এক জোড়া বাচ্চা খরগোশ আছে। খরগোশগুলো এমন যে ওরা এক মাসে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। এরপর থেকে প্রতি মাসে তারা এক জোড়া করে খরগোশ জন্ম দিতে থাকে। যাদের জন্ম দেয় সেগুলোও পরের মাসে বড় হয়। তার পরের মাস থেকে তারাও এক জোড়া করে জন্ম দিতে থাকে। তাহলে বছর শেষে কত জোড়া খরগোশ থাকবে?

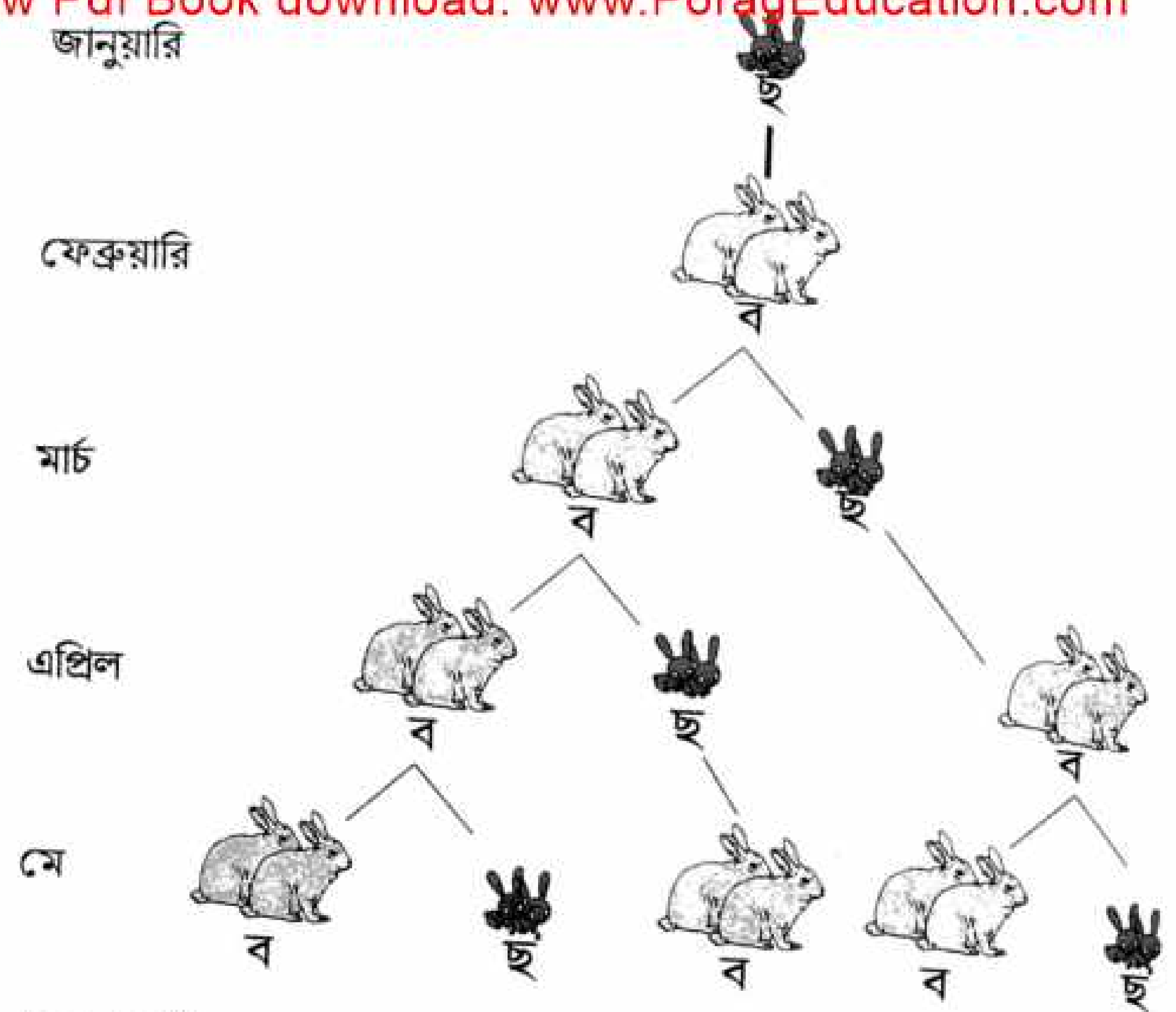

ধরো, ছোট এক জোড়া খরগোশকে আমরা ছ, আর বড় এক জোড়াকে ব দিয়ে লিখলাম। এই ছবিটার দিকে তাকাতে পারো। জানুয়ারিতে ছিল- ছ, এক জোড়া ছোট খরগোশ। ফেব্রুয়ারিতে তারা বড় (ব) হলো।

মার্চ- ব, ছ (বড় জোড়া তো আছে, সাথে এক জোড়া বাচ্চা)

এপ্রিল- ব, ছ, ব (বড় জোড়া আছেই, আরও এক জোড়া বাচ্চা দিয়েছে, আগের ছোট জোড়া বড় হয়ে গেছে)

মে- ব, ছ, ব, ব, ছ (প্রথম বড় জোড়া আছেই, আরও এক জোড়া বাচ্চা দিয়েছে, আগের ছোট জোড়া বড় হয়ে গেছে, এপ্রিলের সেই বড় জোড়াও আছে, সেও আরেক জোড়া বাচ্চা দিয়েছে)

এভাবে যদি জোড়ার সংখ্যা গোনো দেখবে আসবে এমন - ১, ১, ২, ৩, ৫...। দেখো ১ আর ১ যোগ করে হয় ২, এরপর ১ আর ২ যোগ করে ৩। এমন করে আগের দুটো যোগ করে নতুনটা পাওয়া যায়। এটাই ফিবোনাচি সিরিজ। ওপরের ছবিতেও একই জিনিস দেখবে। জানুয়ারির 'ছ' আর ফেব্রুয়ারি 'ব', দুটো মিলে মার্চের 'ব, ছ'। ফেব্রুয়ারির ব, আর মার্চের ব, ছ মিলে এপ্রিলের ব, ছ, ব।

আরও কিছুক্ষণ সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা চলল। যেন উঠতেই মন চায় না। আজ ওঠার সময় টিনা তূর্যের মুখে দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল, ভাইয়া, আজকে কোনো ধাঁধা দেবেন না?

অবশ্যই! ওই বাক্সটার তলায় দেখো।

সেখানে চারটে কাগজ দেখা গেল আগের মতো। বান্টি তখনই পড়ে ফেলল কী লেখা আছে।

ডায়োফেন্টাসের কবর

তৃতীয় শতকের বিখ্যাত গ্রিক গণিতবিদ ডায়োফেন্টাস ভালোবাসতেন সমীকরণ নিয়ে ভাবতে। যেসব সমীকরণের সমাধান শুধু পূর্ণসংখ্যায় হতে পারে। তার নাম অনুসারে সেগুলোকে ডায়োফেন্টাইন সমীকরণ বলে। ডায়োফেন্টাসের লেখা বই 'অ্যারিথমেটিকা' প্রাচীন গ্রিসের শ্রেষ্ঠ গণিত রচনাগুলোর একটি। তার মৃত্যুর প্রায় শত বছর পর আরেক গ্রিক গণিতবিদ মেট্রোডোরাস রচনা করেন নিচের কবিতাটি, ডায়োফেন্টাসের সমাধিফলকে কী লেখা থাকবে সেটা ভেবে। ধাঁধার ছলে ডায়োফেন্টাসের জীবন সম্পর্কে জানা যায় এখান থেকে। নিজের মতো অনুবাদ করে দিলাম কবিতাটি। তোমরা এখান থেকে বের করে ফেলতে পারবে মৃত্যুকালে ডায়োফেন্টাসের বয়স কত ছিল!

এখানে আছেন শুয়ে গুরু ডায়োফেন্টাস— বিস্ময় জাগে সীমাহীন!
এ পাথর বলে দেবে বীজগণিতের সুরে— আয়ু তার ছিল কত দিন!
শৈশব ছিল তার ছ' ভাগের এক ভাগ— কেটে গেল দিন কী মজায়!
বারো ভাগের এক ভাগ দুরন্ত কৈশোর- গোঁফ দাড়ি একটু গজায়।
সাত ভাগের এক ভাগ পরে হলো বিয়েশাদি— একাকী জীবনের আসান,
বছর পাঁচেক পরে— এল ঘর আলো করে— ফুটফুটে ছেলেসন্তান।
জনকের অর্ধেক আয়ু পেল ছেলেটি— নিয়তির নিঠুর বিধান,
পুত্রের শোকে ডায়োফেন্টাস সঁপে দেন— সংখ্যাতত্ত্বে মনপ্রাণ।

বছর চারেক পরে এ ভবের মায়া ছেড়ে তিনিও গেলেন পরপার,
ওহে জ্ঞানী-গুণীজন, কর দেখি নিরূপণ— ক'বছর আয়ু ছিল তার!

বাসায় ফিরতে ফিরতে বান্টির মনে হলো এটা আসলে খুব সহজ ধাঁধা। বয়সটাকে x ধরে নিলেই হয়ে যাবে। হলোও তা-ই। হঠাৎ তার মাথায় প্রশ্ন এল, আচ্ছা আমরা x ধরি কেন? অন্য কোনো অক্ষরও তো ধরতে পারতাম। কাল ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

অধ্যায় ৪

বীজগণিতের বিচিত্র চিন্তা

৪.১

তূর্যের আজকে বাসায় ফিরতে দেরি হলো একটু। ঢাকা থেকে ওর বেশ কয়েকজন বন্ধু এসেছে, তাদের সাথে নদীর পাড়ে আড্ডা দিতে দিতে ওর মনেই ছিল না, সন্ধ্যায় ওর ছাত্রছাত্রীরা আসবে। মনে পড়তেই বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিল তড়িঘড়ি করে। স্থানীয় বন্ধুরা টিনা আর তন্বীকে ইঙ্গিত করে কয়েকটা কথাও শুনিয়ে দিল। তূর্যের অবশ্য গায়ে লাগল না। সে জানে ওর প্রতি খুব শ্রদ্ধার জায়গা একটা আছে মেয়েগুলোর, অন্যায়ের সীমারেখা সে কখনোই অতিক্রম করবে না।

যত দ্রুত পারে সাইকেল চালিয়ে ঘরে ফিরে এল তূর্য। কলাপসিবল গেটের ভেতরে সাইকেলটা কোনোমতে রেখে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল সে। আধা ঘণ্টার ওপরে অপেক্ষা করছিল তূর্যের ছাত্রছাত্রীরা, বেশ অধৈর্য দেখাচ্ছিল সবাইকে। তূর্য ঢুকেই ক্ষমা চেয়ে নিল দেরির জন্য। বেচারার বেগতিক অবস্থা দেখে আর কিছু বলল না কেউ। হাত-মুখ ধুয়ে এসে দেখে তূর্যের মা সবার জন্য পাকান পিঠা ভেজে এনেছিলেন, তূর্যের জন্য দেড়খানা রেখে বাকিগুলো সবাই সাবাড় করে দিয়েছে। অর্ধেকটা দেখিয়ে বান্টি বলল, ভাই, দ্বি বিয়োগ অর্ধ দ্ব্যর্ধ! হেসে সেটা মুখে পুরে তূর্য বলল, আডকেবীডগনিট। সবাই প্রায় একসাথে জিজ্ঞেস করল, কী?

আজকে বীজগণিত!

এক ঘণ্টা অঙ্ক করানোর পর তূর্য বলল, ব্যস আর না। এইবার প্রশ্নোত্তরের পালা। বলো বৎসগণ, কী জানিতে চাহো?

বান্টি হাত তুলতে যাচ্ছিল, তার আগেই তন্বী প্রথম প্রশ্ন করল, ভাইয়া, এটাকে বীজগণিত নাম দিল কেন?

বীজগণিত আর পাটিগণিতের নামরহস্য

তূর্য জানাল, ও পুরোপুরি নিশ্চিত না। তবে তার ধারণা, একটা সমীকরণের বীজ বলতে বোঝায় ওই সমীকরণের সমাধান বা মূল (root)। বীজগণিতের একটা বড় অংশ এই সমীকরণের মূল বের করার কাজে ব্যবহৃত হয়। এ জন্যই হয়তো এটাকে বীজগণিত বলে। এ প্রসঙ্গে ও বলল, পাটিগণিতের পাটি মানে জানো তো তোমরা? পাটি মানে হলো সারি, যেমন এক পাটি দাঁত। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ এগুলো করার সময় সারিবদ্ধভাবে সংখ্যা লিখে হিসাব করা হতো। সেখান থেকেই পাটিগণিত।

a, b, c, d না ধরে অজানা রাশি কেন x ধরে নিই?

সে কথা থাক, আবার বীজগণিতে আসি। বীজগণিতের আসল মজা তোমরা জানো, ওখানে আমরা সমাধানে একটা অজানা রাশিকে (unknown quantity) চলক(variable) হিসেবে ধরে নিতে পারি। এই যেমন, x ধরি, বা 'ক' ধরি।

বান্টি এটা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিল গতকাল রাত থেকেই। সুযোগ পেয়েই জিজ্ঞেস করল, আমরা a, b, c, d না ধরে ইংরেজির x অক্ষরটাই কেন ধরে নিই? এটার কী এমন বিশেষত্ব?

তূর্যের মনে পড়ল কয়েক দিন আগে ইউটিউবে দেখা একটা ভিডিওর কথা। তোমরা কি TedEx-এর নাম শুনেছ? ওরা কেউ শোনেনি শুনে তূর্য বলল, ইউটিউবে টেডেক্সের খুব সুন্দর কিছু ভিডিও পাওয়া যায়, বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ সেখানে তাদের জ্ঞান, ভাবনা অন্য মানুষের সামনে তুলে ধরেন। কিছু কিছু ভিডিও খুবই অনুপ্রেরণাদায়ক, চাইলে দেখতে পারো! তো সেখানে টেরি মুর নামে একজন ভদ্রলোক বলেছেন কেন আমরা এক্স ধরি। এই যে বীজগণিত, এটার ইংরেজি তো অ্যালজেবরা। সেটা এসেছে মধ্যযুগের বিখ্যাত আরব গণিতবিদ মুসা আল খোয়ারিজমির বই 'হিসাব আল জাবর ওয়াল মুকাবিলা' থেকে। 'আল জাবর' দিয়ে বোঝায় রাশিগুলো সাজানো, যেটাকে আমরা এখন বলি 'পক্ষান্তর' করা। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে আরবদের এই গণিতজ্ঞান পৌঁছে যায় ইউরোপে— স্প্যানিশদের কাছে। সেখানে গণিতবিদদের মাঝে এই নতুন ধরনের গণিত নিয়ে দারুণ আগ্রহ জন্মায়, তারা তাদের ভাষায় এই গণিতকে অনুবাদ করার চেষ্টা করে। কিন্তু অনুবাদ কাজটা সহজ ছিল না। আরবি ভাষার অনেক অক্ষর আছে যেগুলো ইউরোপীয়দের জন্য উচ্চারণ করা খুব কঠিন। আরবিতে শিন বলে একটা অক্ষর আছে, যেটা দিয়ে তৈরি একটা শব্দ হলো 'শালান', যে শব্দের মানে হলো 'কিছু'। এর সামনে 'আল' বসিয়ে হয় 'আল-শালান' বা 'কিছু একটা'। এই শব্দটা আরব গণিতবিদেরা অজানা রাশি বোঝাতে ব্যবহার করতেন। স্প্যানিশ অনুবাদকেরা এই শব্দটা নিয়ে পড়লেন বিপাকে। যেহেতু অজানা রাশি বোঝাতে এই শব্দটা খুবই প্রচলিত— তারা অজানা বোঝাতে এই শব্দটাই ব্যবহার করতে চাইলেন, কিন্তু তাদের ভাষায় 'শশশ' উচ্চারণটাই নাই! তারা ঠিক করলেন তারা উচ্চারণ করবেন 'ক' আর 'খ' এর মাঝামাঝি— যেটাকে তারা লিখতেন গ্রিক অক্ষর 'কাই' দিয়ে যা দেখতে ইংরেজি 'x' অক্ষরের মতো। লাতিনরা যখন স্প্যানিশ ভাষা থেকে অনুবাদ করলেন, তারা কাই বাদ দিয়ে তাদের নিজের প্রতীক 'x' ব্যবহার করলেন। ওখান থেকেই গেল ইংরেজিতে আর তারপরে সব ভাষায়!

বান্টি ফোড়ন কাটল, তার মানে স্প্যানিশ ব্যাটারা শ বলতে পারত না বলে আমাদের এক্স বলতে হয়! মারাত্মক ব্যাপার-স্যাপার!

হুম, তবে তার মতের বিরোধিতাও আছে। অনেকে বলেছেন, এখন স্প্যানিশে 'শ' না থাকলেও প্রাচীন স্প্যানিশ ভাষায় 'শ' ছিল এবং সেটা 'X'-এর মতো দেখতে একটা প্রতীক দিয়েই লেখা হতো।

দিলেন তো মজাটা নষ্ট করে। সবাই হেসে উঠল। পৃথ্বী বলল, আমাদের

স্যার বলেছিলেন a, b, c, d এগুলো দিয়ে বোঝায় জানা রাশি আর x, y, z এগুলো দিয়ে অজানা। সেটা কি তাহলে ভুল?

না, না, উনি ঠিকই বলেছেন। a, b, c, d জানা রাশি আর x, y, z অজানা এভাবে লিখতে প্রথম শুরু করেন বিখ্যাত গণিতবিদ রেনে দেকার্তে, যিনি স্থানাঙ্ক জ্যামিতির উদ্ভাবক। তবে আমি যে গল্পটা বললাম সেটা আরও চার শ বছর আগের কথা, তত দিনে x-কে চলক হিসাবে লেখাটা রেওয়াজ হয়ে গেছে।

অত বীজগণিত শিখে লাভ কী?

এবার টিনা প্রশ্ন করল, আচ্ছা ভাইয়া, বীজগণিতে আমরা তো অনেক কিছু শিখি— এগুলোর কি আদৌ কোনো দরকার আছে? সমীকরণ সমাধানের ব্যাপারটা আধটু-একটু বুঝি যে কাজে লাগে; কিন্তু এই যে মনে করেন, 'উৎপাদকে বিশ্লেষণ'— এই সব জিনিস দিয়ে কী লাভ হয়? জীবনটা এমনিই কঠিন, আরও কঠিন বানায়ে কী লাভটা হলো গণিতবিদদের?

তূর্য মুখ হাসি হাসি করে বাকিদের দিকে তাকাল, বাকিদেরও চোখেও একই জিজ্ঞাসা! তূর্য বলল, শেখার সময় কিছু ক্ষেত্রে তোমাকে শেষটা না দেখেই শুরু করতে হবে, কিছুটা ভরসা তোমার বই আর শিক্ষকের ওপর রাখতেই হবে। এই যে উৎপাদকে বিশ্লেষণ—এটা বীজগাণিতিক রাশিগুলোকে সাজানোর খুব প্রাথমিক একটা ভিত্তি। মনে করো, একটা সমীকরণ আছে যেখানে x-এর সর্বোচ্চ সূচক চার। চারঘাতের রাশির সমাধান হয় চার রকমের। তুমি যদি সব পদ বামপাশে নিয়ে ডান দিকে শূন্য বানাও, এরপর বড় রাশিটাকে চারটে ছোট রাশির গুণ আকারে দেখাতে পারো, তাহলেই কিন্তু চারটে মান পেয়ে যাবে। এগুলো ছোট ছোট কৌশল।

একটা কথা বলি, যে মানুষটাকে দেখলে তোমার মনে হয়, সে অনেক বড় বড় জিনিসপত্র পারে, ভালো করে দেখলে দেখবে, সে আসলে খুব ছোট ছোট কিছু কৌশল জানে, অনেকগুলো ছোট ছোট কাজ সুন্দর করে করতে পারে!

গণিতের একটি জাদু ও তার ব্যাখ্যা

তূর্যের হঠাৎ যেন কিছু একটা মনে পড়ল, ও বলল, কৌশলের কথা যখন বললাম, চলো তোমাদের অঙ্কের একটা জাদু শেখাই। পৃথ্বী, মনে মনে একটা সংখ্যা ধরো। কাউকে বলবে না কিন্তু। পৃথ্বী ধরল ৭।

এবার সংখ্যাটাকে দ্বিগুণ করো। পৃথ্বী মনে মনে ভাবল, '১৪'।

এবারে টিনা, তুমি ওকে একটা সংখ্যা বলো, আমাদের সবার সামনেই বলো, অসুবিধা নাই। আর পৃথ্বী তুমি টিনার সংখ্যাটাকে তোমার যোগফলের সাথে মনে মনে যোগ দাও। টিনা বলল, '১০'। পৃথ্বী যোগ করে পেল '২৪'।

গুড। এবার পৃথ্বী, তোমার যোগফলটাকে অর্ধেক করো। সেখান থেকে মূল যে সংখ্যাটা ধরেছিলে সেটা বাদ দাও। পৃথ্বী অর্ধেক করে পেল ১২, সেখান থেকে মূল সংখ্যা মানে ৭ বাদ দিয়ে পেল ৫।

একটু আগে টিনা যখন সংখ্যাটা বলছিল তখনই তূর্য বান্টির খাতা নিয়ে শেষ পৃষ্ঠায় একটা সংখ্যা লিখে খাতাটা উল্টে রেখেছিল। তূর্য রহস্য করে বলল, আমি কিন্তু তোমার মন পড়ে ফেলতে পারি! বিশ্বাস না হলে বান্টির খাতার তলায় দেখো।

পৃথ্বী উল্টে দেখল ওখানে বড়ো করে লেখা ৫। ওর মুখ আবার হাঁ হয়ে গেল। বিস্ময় নিয়ে তূর্যের দিকে তাকাল ও।

তন্বী বিশেষ খুশি হলো না, ভাইয়া এটা আমি পারি। আপনি শুধু টিনার দেওয়া ১০-কে অর্ধেক করেছেন, তাই না?

তূর্য বলল, ঠিক তাই। এটা গণিতের খুব প্রচলিত একটা খেলা, আমি জানি তোমাদের অনেকেই খেলাটা জানো। কিন্তু তুমি কী জানো কেন অর্ধেক করলেই হয়ে যায়? এবার তন্বী নীরব। তূর্য বান্টির খাতাটা টেনে নিল। মনে করো, পৃথ্বী ধরেছে a আর টিনার দেওয়া সংখ্যা b।

এটাকে a দ্বিগুণ করলে 2a, তার সাথে b যোগ দিলে (2a+b)। অর্ধেক করলে $\frac{2a+b}{2}$। এখান থেকে a বাদ দিলে পাবে $\frac{2a+b}{2} - a$

বা, $\frac{2a+b}{2} - a = \frac{2a+b-2a}{2} = \frac{b}{2}$

দেখেছ, পেয়ে গেলাম $\frac{b}{2}$, মানে টিনা যা ধরেছিল তার অর্ধেক।

এমন যত খেলা আছে সবগুলোই বীজগণিত দিয়ে বুঝে ফেলা যায়।

গণিতের আরেক জাদু এবং তার ব্যাখ্যা

ভাইয়া, একবার শুনেছিলাম ৬ বা ৭ অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যাকে তিনটা সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ শূন্য হয়? ওই সংখ্যাগুলো কী কী একটু বলবেন?

এটাও একটা মজার খেলা। তিন অঙ্কের যেকোনো সংখ্যা নাও! সংখ্যাটাকে আবার লিখে পাশাপাশি বসাও! ছয় অঙ্কের একটা সংখ্যা পাবে! এই ছয় অঙ্কের সংখ্যাটা অবশ্যই ৭, ১১ আর ১৩ দিয়ে বিভাজ্য হবে! আমার ধারণা তোমরা এটার কথাই বলছ!

এটা আসলে সহজ একটা ফাঁকি! তিন অঙ্কের কোনো সংখ্যাকে আবার পাশাপাশি বসানোর মানে হলো তাকে ১০০১ দিয়ে গুণ করা! যেমন ১৪৩×১০০১= ১৪৩১৪৩

কারণ ১০০০ দিয়ে গুণ দিলে শেষে তিনটি শূন্য থাকবে! আর ১ দিয়ে গুণ দেওয়া মানে আগের সংখ্যাটাই ওই শূন্যগুলোর সাথে যোগ করে দেওয়া!

তার মানে ১৪৩১৪৩-এর মধ্যে আছে ১৪৩ আর ১০০১; কিন্তু ১০০১-এর মধ্যে কী আছে? ১০০১=৭×১১×১৩

অর্থাৎ ১৪৩১৪৩ = ১৪৩×৭×১১×১৩

তাই সংখ্যাটা ৭, ১৩ আর ১১ দিয়ে বিভাজ্য! এখানে ১৪৩ না হয়ে তিন অঙ্কের যেকোনো সংখ্যা হলেও এটা কাজ করবে!

কথায় কথায় তূর্য জানাল, বীজগণিতের আরেকটা সূত্র আমার খুবই প্রিয়।

$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$’’

বান্টি তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, ভাইয়া, এইটা কী বললেন? এই সূত্র আবার প্রিয় হয় নাকি কারও?

তূর্য চোখ বাঁকিয়ে বান্টিকে বলল, মুখে মুখে বলো তো ১১৩-এর বর্গ কত?

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে দেখে তূর্য বলল, তোমাদের অধিকাংশই মুখে মুখে বলতে পারবে না, আমি জানি। কিন্তু একটু পরেই তোমরা পারবে, ভরসা রাখো আমার ওপরে।

সংখ্যা নিঃসন্দেহে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ব্যাপারগুলোর একটা। আমার ক্লাস নাইন-টেনের একটা বড় সময় চলে গেছে সংখ্যা নিয়ে ভাবতে ভাবতে। আর সেই সময়টা যে কী অসম্ভব সুন্দর কেটেছে, সেটা ভাষা দিয়ে বোঝাতে পারব না।

মনে মনে বর্গ করার উপায়

তোমাদের বয়সে আমার খুব প্রিয় একটা কাজ ছিল মনে মনে সংখ্যার বর্গ করা। খুব দ্রুত পারতাম না আমি সাধারণ মানুষ, কোনো প্রডিজি না, তবে দুই ঘর হলে পারতাম।

এখন তোমাদের চলো শিখিয়ে দিই, মনে মনে কীভাবে বর্গ করতে হয়।

সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে টেবিলে ভাইয়ার খাতার দিকে তাকাল। সেখানে কতগুলো সংখ্যা লিখল সে। তারপর দার্শনিকের মতো বলল, গণিত শিখতে হলে আগে দেখতে শিখতে হবে, গভীরভাবে দেখতে হবে। হৃদয়ের সবগুলো জানালা খুলে দাও, আলো আসুক, বাতাস আসুক—যদি কোনো দুঃসংবাদ আসতে চায়, তাকেও আসতে দাও... সবকিছু আসুক... ভুলটাকে পরে ফেলে দেওয়া যাবে। এসো, এই প্যাটার্নগুলো ভালো করে দেখো...।

১১-এর বর্গ = ১২১
১০১-এর বর্গ = ১০২০১
১০০১-এর বর্গ =১০০২০০১
১০০০১-এর বর্গ =১০০০২০০০১

সবাই দেখতে দেখতে বুঝল, ব্যাপারটা মজার।

এখন আমি যদি জিজ্ঞেস করি, বলো তো, ১ (এরপর ১ কোটিটা শূন্য) ১-এর বর্গ কত? বলতে পারবে?

সবাই প্রায় একসাথে বলল,

১ (এরপর ১ কোটিটা শূন্য) ২ (এরপর ১ কোটিটা শূন্য) ১

বাহ! আবার লক্ষ করো,

১০১-এর বর্গ = ১ ০২ ০১

১০২-এর বর্গ = ১ ০৪ ০৪

১০৩-এর বর্গ = ১ ০৬ ০৯

১০৪-এর বর্গ = ১ ০৮ ১৬

এইটুকু দেখা হলে একটু থামো। ভালো করে আবার দেখো।

মূল সংখ্যাটার দিকে একবার তাকাও, আর এর বর্গের দিকে একবার তাকাও, দেখো তো কোনো মিল খুঁজে পাও কি না।

একটু তাকালেই দেখবে আমার মূল সংখ্যাগুলো সব শুরু হয়েছে ১ দিয়ে আর তারপর দুইটা ঘর আছে।

বর্গটাতে শুরুতেই আছে ১। এরপর দুইটা দুইটা করে ঘর রেখেছি। তাকিয়ে দেখো প্রথম দুই ঘরে আছে দ্বিগুণ আর শেষ দুই ঘরে আছে বর্গ।

যেমন ১০৪-এর ক্ষেত্রে প্রথমে ১-এর পর দুইটা দুইটা করে ঘর রেখেছি

১ -- --

এরপর প্রথম দুই ঘরে বসিয়েছি ০৪-এর দ্বিগুণ ০৮

১ ০৮ --

আর শেষ দুই ঘরে বসিয়েছি ০৪-এর বর্গ ১৬

১ ০৮ ১৬

তাহলে এবার তোমরা বলো তো, ১০৫-এর বর্গ কত? সবাই পেরে গেল!

১০৫-এর বর্গ = ১ ১০ ২৫

ঠিক একইভাবে ১০৬-এর বর্গ = ১ ১২ ৩৬

এখন যদি প্রশ্ন করি, আচ্ছা বলো তো,

১১২-এর বর্গ কত?

তাহলে সামান্য ঝামেলায় পড়তে পারো...

প্রথমে তো ১ লিখে জায়গা রাখলে দুটো দুটো করে

১ -- --

প্রথম দুই ঘরে বসল ১২ দুগুণে ২৪

১ ২৪ --

এরপরেই ঝামেলা— ১২-এর বর্গ হলো ১৪৪ সেটাতে আছে ৩ ঘর। কিন্তু আমাদের বর্গের শেষে তো মাত্র দুটি ঘর ফাঁকা আছে, তাহলে?

চিন্তা কী? শেষ দুই ঘরে ১৪৪-এর ৪৪ বসবে, হাতে থাকবে ১। সেটা গিয়ে যোগ হবে ২৪-এর সাথে, হবে ২৫।

তাহলে সংখ্যাটা হবে- ১ ২৫ ৪৪

ব্যস! ওটাই হবে ১১২-এর বর্গ।

তাহলে বান্টি, এবার কী পারবে, ১১৩-এর বর্গ কত হবে বলতে?

বান্টি বলল, ১ তারপর হবে ২৬, তারপর ১৩-এর বর্গ ১৬৯। ১ হাতে থাকবে।

সুতরাং ১১৩-এর বর্গ হবে ১ ২৭ ৬৯। ঠিক আছে ভাইয়া?

অবশ্যই!

বান্টি মনে হলো বিরাট একটা কাজ করে ফেলেছে। সে মনে মনে তিন

ঘরের একটা সংখ্যার বর্গ করে ফেলেছে—এটা ভেবেই আনন্দে অস্থির হয়ে গেল। এটা যেন গণিত নিয়ে তার ১৫ বছরের জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন!

তূর্য থামল না। ও বলল, যদি এতক্ষণ যা বললাম সেটা দেখে থাকো, তাহলে কি বলতে পারবে ১ ০১২-এর বর্গ কত?

তন্বী বলল, এবারে কি আমাদের তিনটা তিনটা করে ঘর নিতে হবে?

তূর্য বলল, হ্যাঁ, মূল সংখ্যায় ১-এর পর তিনটা ঘর আছে, তাই বর্গ করার সময় ১-এর পর তিনটা তিনটা করে ঘর রাখো এভাবে

১ --- ---

আগের মতো প্রথম তিন ঘরে বসবে ০১২-এর দ্বিগুণ, আর শেষের তিন ঘরে বর্গ; সংখ্যাটা দাঁড়াবে ১ ০২৪ ১৪৪

উত্তর ঠিক আছে, কিন্তু একটা ব্যাপার আছে। আমি এতক্ষণ যা করলাম সেটা অনেকটা প্রাইমারি স্কুলের স্যারদের মতো-- 'তোরা দ্যাখ, এমনে এমনে অঙ্ক করতে হয়।' কেন এটা হলো সেটা বলিনি। কিন্তু গণিতের আনন্দের একটা বড় অংশ এই 'কেন' প্রশ্নটা জুড়ে। তাই তোমাদের বলে রাখি, শিক্ষক যত ভালোই হোন না কেন, তাকে সরাসরি বিশ্বাস করে নেবে না। একবার নিজে ভাববে, তিনি এমন কেন বললেন, এটা কেন হলো, এটা কি আসলেই ঠিক?

এবারে বলি আমার এই নিয়মটা কেন কাজ করে। আসলে এর পেছনে আছে একটা খুবই ক---ঠি---ন সূত্র :

$(a+b)^2= a^2+2ab+b^2$

কী বিশ্বাস হচ্ছে না?

চলো বোঝাই ১০৪-এর বর্গটা দিয়ে। ১০৪=(১০০ + ৪)

এখন $(১০০+৪)^{২}= ১০০^{২} + ২\times১০০\times৪ + ৪^{২}$

$১০০^{২}$	১ ০০ ০০	এ জন্যই বলেছিলাম ১-এর পর দুটো দুটো করে ঘর রাখো
$+ ২\times১০০\times৪$	৮ ০০	মাঝের প্রথম দুই ঘরে ০৪-এর দ্বিগুণ
$+ ৪^{২}$	১৬	শেষের দুই ঘরে ০৪-এর বর্গ
মোট	১ ০৮ ১৬	

টিনা উসখুস করছিল, ভাইয়া, যদি সামনে ১ না থাকে? তখন কী হবে?

খুবই ভালো প্রশ্ন। আমি আমার মূল সংখ্যাটাতে সব সময় সামনে ১ রেখেছি। বোঝানো শুরু করার জন্য এটা অনেক ভালো। কিন্তু দুনিয়ার সব সংখ্যা তো আর ১ দিয়ে শুরু হয় না, তাই না? তাহলে ৫ ০১৩-এর বর্গ কীভাবে করা যাবে? চিন্তা কী? আমরা তো এখন মূল সূত্রটা জানিই। আগেরবার বর্গের প্রথমে ১ রেখেছিলাম কারণ ১-এর বর্গ ১। এখন মূল সংখ্যায় যদি ৫ থাকে, বর্গে থাকবে ২৫ - এ আর এমন কী? এরপর তিনটা তিনটা করে ঘর রাখি—

২৫ --- ---

লক্ষ করো, আগের বার প্রথম তিনটা ঘরে বসিয়েছিলাম শুধু ০১৩-এর দ্বিগুণ। এবারে কিন্তু তা বসালে চলবে না। কারণ মূল সূত্রে আছে 2ab। তাই বসাতে হবে ২×৫×০১৩ = ১৩০। শেষের তিন ঘরে আগেকার মতোই ০১৩-এর বর্গ। সংখ্যাটা দাঁড়াবে— ২৫ ১৩০ ১৬৯

ভেঙে বললে, ৫০১৩=(৫০০০+১৩)। এখন $(৫০০০+১৩)^{২}=$

$৫০০০^{২}$	২৫ ০০০ ০০০	এ জন্যই বলেছিলাম ২৫-এর পর তিনটা তিনটা করে ঘর রাখো
$+ ২\times৫০০০\times১৩$	১৩০ ০০০	মাঝের ঘরে 2ab
$+ ১৩^{২}$	১৬৯	শেষের দুই ঘরে ১৩-এর বর্গ
মোট	২৫ ১৩০ ১৬৯	

এই কাজগুলো মনে মনে করাটা কি খুব কঠিন? মনে হয় না।

এবং তুমি কি বুঝতে পারছ, তুমি কত শক্তিশালী হয়ে উঠেছ?

তুমি যদি তোমার কোনো বন্ধুকে গিয়ে বলো যে ৫০১৩-এর বর্গ— এ আর এমন কী— এটা হলো ২৫ ১৩০ ১৬৯ বা দুই কোটি একান্ন লক্ষ তিরিশ হাজার এক শ উনসত্তর,

তোমার কি মনে হয়, সে অবাক হবে না? অথচ দেখ সূত্রটা কত চেনা; সেই ছেলেবেলার 'এ প্লাস বি হোল-স্কয়ার'-এর সূত্র।

বর্গ এ পর্যন্তই। ও আচ্ছা, তোমরা তো 'এ প্লাস বি হোল-কিউব'-এর সূত্রও জানো। তাহলে ১০২^৩-এর মান যে ১ ০৬ ১২ ০৮ হয়, এটা বোঝো নাকি, চেষ্টা করে দেখো তো।

সবাই ধারণা করতে পারল মূল ব্যাপারটা কেমন হবে। এবার পৃথ্বী বলল, আচ্ছা ভাইয়া, এর উল্টোটা কীভাবে করে?

মানে?

পৃথ্বী বলল, মানে ভাইয়া, আমরা তো এখানে কিউব করলাম, কিন্তু কিউব যদি দেওয়া থাকে মূল সংখ্যাটা কীভাবে বের করা যাবে?

বর্গমূল, ঘনমূল এবং যেকোনোতম মূল বের করার উপায়

তন্বী বলল, আমরা ক্লাস সেভেনে হাতে-কলমে বর্গমূল করা শিখেছিলাম, কিন্তু ঘনমূল পারি না। এটা কি করা যায়?

তূর্য বলল, অবশ্যই যায়। সেখানেও লাগে এ প্লাস বি হোল কিউবের সূত্র [এ বইয়ের শেষে পরিশিষ্ট ১-এ নিয়মটি দেওয়া আছে, আগ্রহীরা অবশ্যই দেখে নিয়ো, অনেক কিছু শিখতে পারবে]। তা ছাড়া দ্বিপদী উপপাদ্য বলে একটা উপপাদ্য আছে, যেটা নিউটন দিয়েছিলেন। তোমরা এটা যদিও ইন্টারমিডিয়েটে গিয়ে শিখবে, তবু হালকা ধারণা দিতে পারি। এটার সাহায্যে অসীম ধারা ব্যবহার করে যেকোনো মূল বের করা যায়।

এর জন্য সংখ্যাটাকে (১+x)^n আকারে নিতে হবে, যেখানে x-এর মান -১ থেকে +১-এর ভেতরে। এরপর দ্বিপদী উপপাদ্যের সাহায্যে বের করা যাবে। সূত্রটা হলো—

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \ldots + \infty$$

এই সূত্র ব্যবহার করার সময় একটু সাজিয়ে নিতে হয়, যেন x টা -১ থেকে ১-এর ভেতরে হয়।

মনে করো, এটা দিয়ে তুমি বের করতে চাও ৫-এর ঘনমূল বা $\sqrt[3]{5} = 5^{\frac{1}{3}}$

এটাকে সাজানো যায় এমন করে $5^{\frac{1}{3}} = (\frac{1}{5})^{-\frac{1}{3}} = (1-\frac{4}{5})^{-\frac{1}{3}}$

এখন আমরা সূত্রে ফেলতে পারব। কারণ x এখন $-\frac{4}{5}$।

$(1-\frac{4}{5})^{-\frac{1}{3}} = 1+(-\frac{1}{3})(-\frac{4}{5})+\frac{(-\frac{1}{3})(-\frac{1}{3}-1)}{2!}(-\frac{4}{5})^2+\ldots+\infty$ এমন করে আরও কয়েকটা পদ নিয়ে মান বের করে যোগ করলে ঘনমূলের একটা অনুমান পাবে। এই ধারার সুবিধা হলো যেকোনো মূল পাওয়া যায়।

বান্টি বলল, ইয়ে মানে এই ধারাটা কীভাবে এল, এইটা কি বলবেন?

তূর্য হেসে বলল, খুবই যৌক্তিক প্রশ্ন। কিন্তু এটা এখনই তোমাদের বোঝাতে পারব না, কিছু উচ্চতর ধারণা ব্যবহার না করে এটা প্রমাণ দেওয়া সম্ভব না।। তবে আগে যা বলেছি, আমি বোঝাতে না পারলেও প্রশ্নকে মেরে ফেলবে না। এটা মাথায় রাখো, মাথায় না থাকলে খাতায় লিখে রাখো। চেষ্টা করো নিজে খুঁজে বের করার। নাহলে যখন এইচএসসি বইয়ে পড়বে, তখন মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করবে। তবু না পারলে আমি তো আছিই!

লগ জিনিসটা আসলে কী?

পৃথ্বী একটু কাঁচুমাচু করে বলল, ভাইয়া, আমার একটা প্রশ্ন আছে। পাওয়ার আর মূল দেখে মনে হলো এখনই জিজ্ঞেস করে ফেলি। ভাইয়া, লগ জিনিসটা কী? লগ দিয়ে অঙ্ক করতে পারি কিন্তু জিনিসটা আসলে কী সেটাই বুঝি না।

তূর্য বলল, কোনো কিছু না জানা অন্যায় কিছু না। জানার আগ্রহ নষ্ট করে ফেলাটা অন্যায়। এই যে তুমি জানতে চেয়েছ আমার কাছে, এতেই অনেকখানি এগিয়ে গেলে তুমি!

বীজগণিতের সাতটা অপারেশন কী কী?

লগ আমি বোঝাব, তার আগে তোমরা বলো, বীজগণিতের সাতটা অপারেশন কি তোমরা জানো?

টিনা বলল, বীজগণিতেও অপারেশন আছে? ওরে বাবা, আমার মনে হয় ব্রেন অপারেশন করতে হবে!

তূর্য বলল, না না, অপারেশন শব্দ দেখে ভয় পেয়ো না! যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ—এগুলোই হলো একেক রকম অপারেশন। এই চারটে ছাড়াও আছে তিনটা সূচকের অপারেশন।

তন্বী বলল, সূচক বা পাওয়ার তো চিনি। কিন্তু এর আবার তিনটা অপারেশন কী রকম?

তূর্য খাতায় লিখল, $২^{৩}=৮$

দেখো, এই লাইনটায় তিনটে সংখ্যা আছে। তাদের বের করার জন্য তিন রকম প্রশ্ন করা যায়,

(i) দুই-এর ওপর সূচক তিন হলে তার মান কত হয়? $২^{৩}=\square$

(ii) কার মাথার ওপর সূচক তিন হলে তার মান আট হয় ? $\square^{৩}=৮$

(iii) দুই-এর ওপর সূচক কত হলে তার মান আট হয়? $২^{\square}=৮$

এই তিন প্রশ্ন থেকে তিন অপারেশন। প্রথমটাকে বলে সূচক। এটা তোমরা জানো, এর মানে দুইকে তিনবার গুণ করতে হবে। এরপর দ্বিতীয়টার দিকে তাকাও— এটা আসলে মূল বের করা। 'কার ওপর সূচক তিন হলে তার মান আট হয়'—এই বাক্যটার আরেকটা মানে হলো 'আট-এর ঘনমূল কত'?

তৃতীয়টার দিকে তাকাও এবার— দুই-এর ওপর সূচক কত হলে তার মান আট হয়? আমরা এখানে পাওয়ারটা কত সেটা খুঁজে বের করছি। এখানেই আছে log। এটাকেই আমরা লিখি $\log_2 8$(দুই ভিত্তিক লগ আট)। এটার মানেই হলো দুইয়ের পাওয়ার কত হলে আট হবে?

তাহলে পৃথ্বী বলো তো, $\log_3 9$— সোজা বাংলায় এটার মানে কী?

পৃথ্বী বলল, $\log_3 9$-এর মানে হলো ৩-এর পাওয়ার কত হলে তার মান ৯ হয়।

এই তো বুঝে গেছ। তাহলে বলো সেই পাওয়ারটা কত?

পৃথ্বী বলল, ৯ হতে গেলে ৩-এর পাওয়ার হতে হবে ২।

বেশ! তার মানে, $\log_3 9=2$।

তন্বী বলল, ও, তাহলে লগ দিয়ে আসলে পাওয়ারটা খুঁজে বের করে। লগ এর উত্তরগুলো আসলে একেকটা পাওয়ার।

হুম, ঠিক ধরেছ!

তন্বীর চোখজোড়া জ্বলজ্বল করে উঠল, এবার বুঝতে পারছি, ভাইয়া কেন log-এর ভিত্তি আর সংখ্যাটা মিলে গেলে তার মান ১ হয়।

টিনা অবাক হয়ে তন্বীর দিকে তাকাল, তন্বীই বুঝিয়ে দিল। দেখো, আমরা জানি, $\log_a a=1$।

হু?

এখন $\log_a a$-এর মানে কী? a-এর পাওয়ার কত হলে তার মান a হবে। নিশ্চয়ই ১ হলে। কোনো সংখ্যার পাওয়ার ১ হলেই তো সংখ্যাটা ওই সংখ্যা নিজেই থাকে!

ও বুঝেছি এইবার!

ঠিক ধরেছ, তূর্য বান্টির দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি চিন্তা করে বলো তো, লগ-এর ভিত্তি কি ১ হতে পারে?

বান্টি ভ্রু কুঁচকে বলল, প্রশ্নটা বুঝিয়ে বলবেন?

তূর্য বলল, আচ্ছা তুমি বলো $\log_1 100$-এর মান কত হবে?

বান্টি বলল, আপনি যেভাবে বললেন, সেটা অনুসারে $\log_1 100$ মানে হলো, ১-এর পাওয়ার কত হলে তার মান ১০০ হবে। ও, এবার বুঝেছি, এটা আসলে সম্ভব না! ১ ওপর যতই পাওয়ার তুলি না কেন, তার মান সারা জীবন ১-ই থাকবে। ১০০ আর কখনো পাওয়া যাবে না।

তূর্য বলল, ঠিক তা-ই। ১০০ কেন, ১ ওপর পাওয়ার তুললে ১ ছাড়া আর কোনো সংখ্যাই পাওয়া যাবে না! তাই ১ কখনো লগ-এর ভিত্তি হয় না।

লগের ভেতর গুণ থাকলে বাইরে আলাদা করে যোগ হয় কেন?

টিনা বলল, তাহলে তো শূন্যও কখনো লগের ভিত্তি হবে না। ০ এর মাথার ওপরে যা-ই বসাই ০-ই তো পাব!

তূর্য মজা করে কুর্নিশ করার মতো করে বলল, জি জনাবা, আপনি সম্পূর্ণ সঠিক! লগের ভিত্তি শূন্যও হয় না কখনো!

এবার তোমাদের বলি, log-এর খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যেটা অনেক কাজে লাগে। log (ab)= log a +log b ; log-এর ভেতরে যদি দুটো সংখ্যা গুণ আকারে থাকে তাহলে তাদের আলাদা করে নিয়ে যোগ আকারে দেখানো যায়। কিন্তু এটার আসলে মানেটা কী, সেটা কি তোমরা জানো? সবাই না সূচক মাথা ঝাঁকাল।

তূর্য বলল, এই যে ভেতরে গুণ ছিল, বাইরে যোগ হয়ে গেল, এটা গাণিতিকভাবে প্রমাণ করা যায় কিন্তু আমি প্রমাণ করতে চাই না। আমি জিনিসটা মন থেকে বুঝতে চাই। এটাও খুব মজার।

এটা জানতে গেলে আগে সূচকের একটা বৈশিষ্ট্য থেকে ঘুরে আসতে হবে। লক্ষ করো এই দুটো গুণ করলে কী হয়— $২^৩\times২^৪= ২^{৩+৪}=২^৭$। আমরা জানি যে এ রকম গুণ করলে পাওয়ার যোগ হয়ে যায়। কেন এ রকম যোগ হলো সেটা কি বোঝো?

$২^৩$ মানে হচ্ছে এখানে ২ সংখ্যাটি ৩ বার গুণ আকারে আছে অর্থাৎ $২^৩=২\times২\times২$ এবং $২^৪$ মানে হচ্ছে এখানে ২ সংখ্যাটি ৪ বার গুণ আকারে আছে অর্থাৎ $২^৪= ২\times২\times২\times২$। তাহলে দুটোর গুণফলে মোট কতগুলো ২ গুণ আকারে আছে?

$২^৩\times২^৪= (২\times২\times২)\times(২\times২\times২\times২)$; দেখো এখানে মোট ৭টি দুই গুণ আকারে আছে। মোট কতগুলো ২ গুণ আকারে রয়েছে সেটা বের করতে ৩ আর ৪ যোগ করছি আমরা। এভাবেই সূচকগুলো যোগ হয়ে যায়।

তাহলে তোমরা এখন জানো যে গুণফলের যে পাওয়ার, সেটা হচ্ছে আলাদা করে প্রতিটা পাওয়ারের যোগফল। জানো, আমরা যখন লিখি log ab= log a + log b, এখানে ঠিক সে কথাটিই বলা হয়েছে। মোটাদাগে, log ab মানে ab-এর পাওয়ার, log a মানে a-এর পাওয়ার আর log b মানে b-এর পাওয়ার।

যাদের ব্যাপারটি এখনো পরিষ্কার হচ্ছে না তাদের পরিষ্কার করানো যাক। চলো, ওপরে যেটা লিখলাম সেটাকে ২ ভিত্তি নিয়ে ভাবি।

$\log_2 (ab)=\log_2 a +\log_2 b$

এখানে ধরি, $a=2^3$, $b=2^4$। ফলে $ab=2^7$

তাহলে এখন দেখো $\log_2 ab = \log_2 2^7$। দেখো, এটার মানেটা মজার। আগের মতো করে ভাবো, $\log_2 2^7$ মানে হলো ২-এর পাওয়ার কত হলে এর মান 2 টু দি পাওয়ার 7 হবে। পাওয়ার বলেই দেওয়া আছে। উত্তর ৭ হবে। $\log_2 2^7=7$

এটা অনেকটা মজার কুইজগুলোর মতো। বলো তো, ২০১৮-এর বিশ্বকাপ ফুটবল কত সালে অনুষ্ঠিত হয়? উত্তর ২০১৮। সবাই হাসল।

তূর্য বলল, আবার দেখো, $\log_2 a= \log_2 2^3=3$, $\log_2 a= \log_2 2^4=4$

তাহলে, $\log_2 (ab)=\log_2 a +\log_2 b$ মানে হলো

$7=3+4$, বা গুণফলের পাওয়ার প্রতিটার পাওয়ারের যোগফল!

এটা জানলে তোমরা এখন ভাগের ব্যাপারটাও ভাবতে পারো, কেন সেখানে বিয়োগ হয়, একইভাবে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে।

লগের ভেতর পাওয়ার থাকলে বাইরে বেরিয়ে আসে কেন?

আরেকটা জিনিসও দেখানো যায়, কেন লগের ভেতরে থাকা পাওয়ার বাইরে বের হয়ে আসে। পাওয়ারকে গুণ আকারে লিখে, তারপর গুণ থেকে যোগ বানিয়েই বুঝে ফেলা যায়।

$\log_2(a^3)=\log_2(a\times a\times a)=\log_2 a+\log_2 a +\log_2 a = 3 \log_2 a$

টিনা অপেক্ষা করছিল কখন ভাইয়া থামবে তার জন্য। একটু থামতেই ও হাত তুলল। তূর্য বুঝে গেছে ও কী বলবে, কী, এই লগ কই কাজে লাগে, এ দিয়ে কী হয়, সেটাই তো জানতে চাও, না?

টিনা একটু লজ্জা পেয়ে বলল, জি ভাইয়া, এটা দিয়ে কী লাভ?

লাভ অনেক। ইংরেজি বর্ণমালায় a, b, c, d যেমন গুরুত্বপূর্ণ গণিতে লগও তাই। এই অপারেশনগুলো হলো গণিতের একেকটা ভিত্তিপ্রস্তর। এগুলোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে গণিত। আচ্ছা বলো তো ১০ ভিত্তিক লগ ১০০০০০০-এর মান কত।

লগ দিয়ে অঙ্কসংখ্যা বের করা

টিনা বুঝে গেছে লগের ব্যাপারটা। ও বলল, $\log_{10}1000000$ মানে হলো ১০-এর পাওয়ার কত হলে এর মান ১০০০০০০ হবে। এখানে ছয়টা শূন্য দেখা যাচ্ছে, তার মানে পাওয়ার হতে হবে ৬। $\log_{10}1000000 = 6$।

বাহ, একইভাবে $\log_{10}10000000=7$। এখন যদি তুমি জানো একটা সংখ্যার ১০ ভিত্তিক লগারিদম ৬.৩, তুমি সংখ্যাটা না বের করেই বলতে পারবে যে সেটা ১০০০০০০ থেকে ১০০০০০০০-এর মধ্যে অবস্থিত। আর এদের ভেতরে অবস্থিত হওয়ার মানে সংখ্যাটাতে নিশ্চয়ই ৭টা ডিজিট বা অঙ্ক আছে। একইভাবে লগ-এর মান ২.৬ মান হলো— সেটা ১০০ আর ১০০০-এর মধ্যে অবস্থিত আর তাতে ৩টা অঙ্ক আছে। দেখো, লগের মান ৬.৩ হলে অঙ্ক সংখ্যা ৭টা, লগের মান ২.৬ হলে অঙ্ক সংখ্যা ৩টা। আচ্ছা বলো তো লগ-এর মান ৩ হলে অঙ্ক সংখ্যা কয়টা?

টিনা বলল, লগ-এর মান ৩, মানে সংখ্যাটা আসলে ১০০০। তাহলে সেখানে অঙ্ক আছে ৪টা।

গুড। তাহলে লগের মানে দশমিকের আগে যে পূর্ণসংখ্যাটা থাকবে, তার এক বেশি হবে অঙ্ক সংখ্যা।

এবারে ধরো, তোমাকে আমি বলেই দিলাম $\log_{10}2=0.301$, বলো দেখি $২^{৬৩}$এর ভেতরে কতগুলো অঙ্ক আছে।

এটা বের করতে হলে, আমাদের ১০ ভিত্তিক লগ নিতে হবে— $\log_{10}2^{63}= 63\times\log_{10}2 = 63\times0.301=18.96$, তাহলে এখানে (১৮+১)=১৯টা অঙ্ক আছে।।

আমাদের সংখ্যাব্যবস্থা যেহেতু ১০ ভিত্তিক, তাই ১০ ভিত্তিক লগারিদম খুব ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া কম্পিউটারে ২ ভিত্তিক সংখ্যা নিয়ে কাজ হয়, সেখানে ২ ভিত্তিক লগ লাগে। আর ক্যালকুলাসের জগতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ধ্রুবক হলো e, যার মান ২.৭১৮২৮১৮...। e ভিত্তিক লগকে বলে natural logarithm, লাতিন শব্দ logarithm naturalis-এর প্রথম বর্ণগুলো নিয়ে এটাকে লেখা হয় ln।

লগের আরেক ব্যবহার

আবার ১০-এর ভিত্তির কথা বলি। আজকাল আমরা ভূমিকম্পের ভয়ে থাকি প্রায়ই। তোমরা হয়তো শুনবে ভূমিকম্পের মাত্রা রিখটার স্কেলে ৬। এই রিখটার স্কেল আসলে log-এর হিসাব স্কেল। মানে কী জানো? মানে হচ্ছে যখন বলে যে রিখটার স্কেলে এর মান হচ্ছে ৬। আসলে এটার মান ৬ না। এটার আসল মান দশ লক্ষ (১০০০০০০)। তার মানে রিখটার স্কেলে যখন এর মান ৬ থেকে ৭ হয়ে যাচ্ছে, তখন এটার মান শুধু ১ বাড়ে না, দশ গুণ বেড়ে যায় আসলে।

দেখ ৬ হওয়া মানে ১০০০০০০ এবং ৭ হওয়া মানে ১০০০০০০০। রিখটার স্কেলে যদি ৭ থেকে ৮ হয় সেটা আর দশ গুণ বেড়ে যায় এবং এটা যদি ৯ হয়, সেটা আরও দশ গুণ বেড়ে যায়।

আরেকটা ব্যাপার দেখো এত বড় বড় সংখ্যাকে লগ দিয়ে কত ছোট করে ফেলা যায়। এ জন্য শ্রদ্ধেয় মুহম্মদ জাফর ইকবাল স্যার তার 'গাণিতিক বাতচিত' নামে একটা লেখায় মজা করে বলেছিলেন, কাউকে যদি গাণিতিকভাবে ঝাড়ি দিতে চাও তাহলে তাকে বলবে, এই... বেশি হম্বিতম্বি করলে তোকে লগ করে ছেড়ে দেব!

লগের ভিত্তি কি ঋণাত্মক হতে পারে?

পৃথ্বী জিজ্ঞেস করল, লগের ভিত্তি কি ঋণাত্মক হতে পারে? স্যার বলেছে, পারে না। কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে এটা সম্ভব। ধরেন $\log_{-2}(-8)$-এর মান তো ৩ হতেই পারে।

তূর্য বলল, সুন্দর প্রশ্ন! আমাদের চেনা বাস্তব সংখ্যার লগারিদমে এদের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না, কারণ দেখো -৮-এর জন্য যদিও পেলে, ৮-এর জন্য কিছু পাবে না! -২ ভিত্তিক অধিকাংশ মান বাস্তব সংখ্যায় পাওয়া যাবে না! বাস্তব সংখ্যায় এ-জাতীয় লগের একটা সুসংজ্ঞায়িত ব্যবস্থা পাওয়া যাচ্ছে না। তাই এড়িয়ে চলে সবাই।

তবে এ ধরনের লগারিদমেরও আসলে অস্তিত্ব আছে, যাকে বলে কমপ্লেক্স লগারিদম!

ক্যালকুলেটর ছাড়া কি লগের মান বের করা যায়?

ভাইয়া, লগারিদমের মান ক্যালকুলেটর ছাড়া বের করার উপায় কী? যেমন মনে করেন $\log_{10}(.056)$-এর মান কীভাবে বের করব?

তূর্য বলল, এটার জন্য এইচএসসির জ্ঞান প্রয়োজন। তবে হালকা ধারণা দিতে পারি। x-এর মান -১ থেকে ১-এর ভেতরে হলে, e-ভিত্তিক লগের মান বের করা যায় এই ধারা দিয়ে $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots$

এখানে x=-০.৯৪৪ হলে, ln (১-০.৯৪৪)= ln (০.০৫৬) পাওয়া যাবে।

এরপর লগের ভিত্তি পরিবর্তনের সূত্র দিয়ে ১০ ভিত্তিক বা যেকোনো ভিত্তিক লগের মান বের করা যায়। সূত্রটা হলো $\log_a c = \log_a b \times \log_b c$ । তোমরা এখন সময় নিয়ে ভাবলে এই লাইনটাও ফিল করতে পারবে। এখানে বলা হচ্ছে পাওয়ারের ওপর পাওয়ার থাকলে সেগুলো গুণ হয়ে যায়, যেমন $(2^3)^4=2^{12}$ । যাহোক তোমরা পরে ভেবো, এখন দেখো, ভিত্তি পরিবর্তনের সূত্র থেকে পাওয়া যায়—

$\log_{10}a = \log_{10}e \times \log_e a = 0.434 \times \ln a$ ।

যদিও মূল ধারাটা বুঝতে পারল না, তবু একটা উপায় যে আছে, এটা দেখেই ওরা খুশি হয়ে গেল। তূর্য জানে সব সময় বোঝাতে না পারার মধ্যে দোষ নেই।

আমি ওদের কৌতূহল পুরোপুরি মেটাতে না পারি, যেন সেটা জাগিয়ে রাখতে পারি, যেন নষ্ট করে না দিই। কৌতূহলের দরজা খোলা থাকুক সব সময়!

অধ্যায় ৫

ফাংশন নিয়ে টেনশন

৫.১

স্কুলে নজিবুল্লাহ সাহেব একটা অদ্ভুত ব্যাপার খেয়াল করলেন। কয়েক দিন ধরে ছাত্রছাত্রীরা আর কেউ তাকে কোনো রকম পাত্তাই দিচ্ছে না। আগে ভয়ে ভয়েও দু-একজন প্রশ্ন করত, এখন তাও করছে না। এমনকি সেদিন ক্লাস থেকে ফেরার পথে আড়চোখে লক্ষ করলেন, তন্বী নীপাকে বলছে, এটা খুব সহজ, আমি তোকে বুঝিয়ে দেব। ওরা কি অন্য কোনো মাস্টারের কাছে পড়তে যাচ্ছে?

অঙ্ক ভাইয়ার ব্যাপারটা জানতে বেশি সময় লাগল না তার। ছোট শহরে কোনো খবরই কারও অগোচর থাকে না। তারপর একদিন তন্বীকে ডেকে পাঠালেন।

আজকাল নাকি খুব অঙ্ক শেখা হয়? কোথাকার এক চ্যাংড়া ছেলে, তার কাছে পড়তে যাস শুনলাম? ও কিছু জানে?

স্যার, উনি তূর্য ভাইয়া। বুয়েটে পড়েন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে। গণিত অলিম্পিয়াডের সাথে যুক্ত।

হাহ! গণিত অলিম্পিয়াড! একটা পরীক্ষা দিয়ে সারা দিন লাফালাফি—এটা দিয়ে গণিত শেখানো যায়? তন্বী মনে মনে কষ্ট পায়। সে জানে ব্যাপারটা মোটেই অমন না। মানুষ যেন গণিতকে ভয় না পায়, যেন এটাকে তার সংস্কৃতির অংশ হিসেবে নিতে পারে, তার জন্যই এই

অলিম্পিয়াডগুলোর আয়োজন করা হয় উৎসবের মতো করে। স্যারকে কিছু বলতে পারে না ভয়ে।

সাহস থাকলে তারে বলবি আমার সাথে দেখা করতে, দেখব কত বড় অঙ্কের জাহাজ সে!

৫.২

সেই দিন সন্ধ্যায় কথা প্রসঙ্গে নজিবুল্লাহ স্যারের কথা তুলল তন্বী। স্যার তূর্যের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন শুনে সেও বেশ উত্তেজিত বোধ করল। পরদিন স্যারের সাথে কথা বলে তন্বী ঠিক করল পরের সোমবার তূর্য দেখা করতে যাবে তার সাথে।

এর মাঝে তূর্য খেয়াল করল নজিবুল্লাহ স্যার সম্পর্কে তার ধারণা সব ঠিক না। ও টিনাদের ক্লাসের বইয়ের অনুশীলনী সমাধান করাচ্ছিল। সে লক্ষ করল, নজিবুল্লাহ স্যার যদিও প্রশ্ন করতে দেন না, ঝাড়ি দেন কথ্য ভাষায়। কিন্তু বইয়ের অঙ্কগুলো কীভাবে করতে হয়, সেটা কঠিনভাবে শেখান। ফলে ছেলেমেয়েরা এসএসসিতে সবাই ভালো করে কিন্তু আসলে ভেতর থেকে কিছু শেখে না। তবু যেহেতু ওরা অঙ্কগুলো ভালো পারে, এতে তূর্যের বেশ সুবিধাই হলো শেখাতে।

তূর্য আরও খেয়াল করল, স্যারের অঙ্ক করানোর ধরনটা খুব গোছানো। যুক্তি সাজানোটাও সুন্দর। টিনাদের কাছ থেকে জানল, স্যার কখনো ওদের জোর করেন না তার কাছে প্রাইভেট পড়তে যাওয়ার জন্য। অন্য একটা স্কুলের অঙ্ক স্যার নাকি তার কাছে প্রাইভেট না পড়লে যাই লিখুক ফেল করিয়ে দেয়। সেই তুলনায় নজিবুল্লাহ মাস্টার অনেক ভালো। তা ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের যতই ঝাড়ি দিন, ওদের দরকারেও সাহায্য করেন তিনি।

এটা জেনে একটা সমস্যা হলো তূর্যের— একই মানুষের এত চেহারা হলে তার সাথে কীভাবে কথা বলে। সে ভেবেছিল স্যারকে কিছু কথা শুনিয়ে দেবে। কিন্তু মানুষ চরিত্র এত বেশি জটিল! গণিত দিয়ে হিসাব মেলে না তূর্যের।

৫.৩

ফাংশন দিয়ে কী হয়?

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওরা যখন পড়তে এল, তূর্যের অঙ্ক করাতে ভালো লাগছিল না তখন। ও বলল, 'আজ ক্লাসের অঙ্ক না। বাইরের কিছু বোঝাব। বলো, তোমরা কী জানতে চাও? এখন মঞ্চ তোমাদের। তোমরা আমাকে যা খুশি জিজ্ঞেস করতে পারো।

তূর্য ভেবেছিল আজকে তার ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন গুলো হবে এমন পাঠ্যপুস্তকের বাইরের বিষয় নিয়ে। কিন্তু টিনা বলে বসল, ভাইয়া, আর কয়দিন পর টেস্ট পরীক্ষা। এখনো ফাংশন বুঝি না। তূর্য হাসল, আচ্ছা ঠিক আছে, অসুবিধা নাই। সব সময় যেভাবে চাইব, সেটাই ঘটবে এমন কোনো কথা নাই।

ফাংশনের বাংলা হলো কাজ। আমার কাছে মনে হয় এটা একটা মেশিনের মতো, কিছু একটা দিলে কিছু একটা পাওয়া যাবে। যেমন জুস বানানোর মেশিন। আপেল ছেড়ে দেবে, জুস বের হবে। এখানে আপেল হলো ইনপুট আর জুস হলো আউটপুট। গণিতে আমরা যখন লিখি $f(x)=x^2$

এর মানে হলো এটা এমন একটা যন্ত্র যেখানে x দিলে বের হবে x^2, মানে যাকেই দেবে তাকে যন্ত্রটা বর্গ করে ছেড়ে দেবে।

এইটা তো বুঝি কিন্তু ডোমেন রেঞ্জ কী জিনিস?

ও আচ্ছা। দেখো, এই যে আমি বললাম, ফলের জুস বানানোর মেশিন। এখানে তুমি যা খুশি তা-ই ইনপুট দিতে পারো? কমলা দাও, আপেল দাও, কলা দাও, ভালো— কিন্তু যদি একটা পাথর ছেড়ে দাও, তাহলে? তোমার যন্ত্রের দফারফা। বুঝতেই পারছ ওসব দেওয়া যাবে না।

তো একটা যন্ত্রে যা যা তুমি দিতে পারো, সেটার সেট হলো ডোমেন, আর যা যা পাওয়া যায় সেটা হলো রেঞ্জ। আমাদের এই ফাংশনটাকে লেখা যায় এভাবে

f(ফল) = ফলের জুস

এটার মধ্যে আপেল, কমলা, আম দিলে হবে—

f(আপেল) = আপেলের জুস

f(কমলা) = কমলার জুস

f(আম) = আমের জুস

এখানে ফাংশনটার ডোমেন হবে {আপেল, কমলা, আম,...} রেঞ্জ হবে {আপেলের জুস, কমলার জুস, আমের জুস,...}

f(পাথর) কী হবে?

অসংজ্ঞায়িত!

তবে ফাংশনের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে, একটা ইনপুটের আউটপুট সব সময় একটাই পাওয়া যাবে। আপেল ইনপুট দিলে একবার আপেলের জুস, একবার কমলার জুস এমনটা কখনো পাবে না। একেকবার একেক উত্তর দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ একটা প্রশ্নের একাধিক উত্তর হওয়া চলবে না।

অবশ্য একাধিক প্রশ্নের একই উত্তর হতে পারে। যেমন ধরো, তোমার উচ্চতা মাপার মেশিন একটা ফাংশন। মেশিন যদি ঠিক থাকে, তোমার উচ্চতা একটাই আসবে, একেকবার একেকটা আসবে না। আবার তোমার একটা বন্ধু থাকতেই পারে, যার উচ্চতা তোমার সমান। তোমাদের দুজনের জন্যই একই মান আসবে তখন। তাতে অসুবিধা নাই।

গাণিতিক ফাংশন দিয়ে বললে, $f(x)=x^2$ এখানে তুমি ২ ইনপুট দিলে সব সময় ৪ ই পাবে। কখনো আর অন্যকিছু পাবে না। -২ দিলেও ৪ পাবে। একাধিক ইনপুটের একই আউটপুট হতে পারে, তবে যা-ই ইনপুট দাও যেন একাধিক আউটপুট না হয়।

পরমমান তুললে প্লাস-মাইনাস লিখতে হয় কেন?

এবার প্রশ্ন করল পৃথ্বী, ভাইয়া, পরমমানের কিছু সমস্যায় দেখেছি পরমমান ওঠানোর পরে প্লাস-মাইনাস চিহ্ন দেওয়া লাগে। তাহলে দুইটা মান হয়ে গেল না?

তূর্য বলল, যখন প্রথম দেখেছিলাম এটা নিয়ে আমারও দ্বিধা ছিল, একটু ভাবতেই বুঝে গেছি ☺। এটা নিশ্চয়ই জানো যে পরমমান আসলে মূলবিন্দু থেকে দূরত্ব নির্দেশ করে। তাই এটা সব সময়ই ধনাত্মক হয়।

এখন আমাকে অন্য একটা প্রশ্নের উত্তর দাও— একটা রাশির সামনে মাইনাস চিহ্ন থাকলে সেটা কি ঋণাত্মক হবেই?

সবাইকে বিভ্রান্ত দেখাল, তাই তো হওয়ার কথা।

উঁহু, উত্তর হলো— না!

যেমন ধরো $-x$; এখানে x যদি নিজেই ঋণাত্মক হয়? ধরো x এর মান -8, তাহলে $-x$ এর মান কত হবে? $-(-8) = 8$; এটা কিন্তু ধনাত্মক! তার মানে আমরা বলতে পারি, x যদি নিজে ঋণাত্মক হয় তাহলে $-x$ হবে ধনাত্মক!

এবার বলো, x যদি নিজে ঋণাত্মক হয় তখন $|x|$-এর মান কত? উত্তর হলো $-x$; x তো নিজে ঋণাত্মক, তার সামনে মাইনাস বসিয়ে এটাকে ধনাত্মক বানানো হয়! ফলে পরমমানের মান কিন্তু ধনাত্মকই থাকল!

$|-4|=-(-4)=4;$

এটুকু বুঝলে এখন পরমমানের এই সংজ্ঞাটা বুঝতে পারার কথা

$$
\begin{aligned}
|x| &= x, \text{ যখন } x \geq 0 \\
&= -x, \text{ যখন } x < 0
\end{aligned}
$$

x-এর মান ধনাত্মক বা শূন্য হলে পরমমানের মান সেটাই হবে! x-এর মান ঋণাত্মক হলে সামনে মাইনাস বসিয়ে ওটাকে ধনাত্মক বানাতে হবে। এবার পরমমানের ভেতরে একটা রাশির কথা ভাবো। ধরো, $|2x-4|$। যেহেতু ভেতরে একটা চলক আছে, সরাসরি এটার মান আমরা বলতে পারব না! যদি ভেতরের রাশিটা মানে $2x-4$ ঋণাত্মক হয়, তাহলে উপরের সংজ্ঞা থেকে বলা যায়—

$|2x-4|=-(2x-4);$

কিন্তু $2x-4$ কখন ঋণাত্মক হবে? যখন $2x-4 < 0$, বা, $2x < 4$, বা, $x < 2$

একইভাবে, যদি ভেতরের রাশিটা মানে $2x-4$ ধনাত্মক বা শূন্য হয়, তাহলে $|2x-4|=(2x-4)$;

তার মানে এটা হবে যখন $2x-4 \geq 0$, বা, $2x \geq 4$, বা, $x \geq 2$

অর্থাৎ $|2x-4| = 2x-4$, যখন $x \geq 2$,

$= -(2x-4)$, যখন $x<2$

মনের শান্তির জন্য x-এর মান ২-এর চেয়ে ছোট যেমন ১ বসিয়ে দেখতে পারো! -(২×১ - ৪)=-(-২) = ২

পরমমানের মান ধনাত্মকই থাকল!

√4=কত? +2, -2 নাকি ±2

তন্বী জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা ভাইয়া, প্লাস-মাইনাসের কথা শুনে মনে পড়ল : √4-এর মান আসলে কত? সাধারণভাবে তো সব জায়গায় ধনাত্মক মানটাই লেখা থাকে দেখি। কিন্তু root-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী তো ±2 হওয়া উচিত। আমি তো বুঝি √4 মানে হলো কাকে বর্গ করলে 4 পাওয়া যায়। আবার $x^2=4$ হলে তখন দেখি $x=\pm 2$ ই লেখা থাকে... ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে দেবেন?

তূর্য বলল, √4-এর মান আসলে শুধু +2। এটা হলো '√' এই ফাংশনটার ব্যাপার। মনে আছে, বলেছিলাম, 'ফাংশন'-এর সংজ্ঞায় আছে— একাধিক আউটপুট হওয়া যাবে না? সেটা মানতে এখানে একটা মানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটাকে বলে Principal Square Root বা প্রধান বর্গমূল। এটার সংজ্ঞা এমন :

$\sqrt{(a^2)}=|a|, a \in R.$

ফলে $\sqrt{4} = \sqrt{(2^2)} = |2| = 2$

আবার -২ ব্যবহার করেও লেখা যায়, $\sqrt{4} = \sqrt{(-2^2)} = |-2| = 2$। দুটো ক্ষেত্রেই পাব ২। তোমার কথা ঠিক যে ৪ এর বর্গমূল দুইটা; কিন্তু এর 'প্রধান বর্গমূল' আছে একটা। আর সেটাকেই লেখা হয় √ প্রতীকটা দিয়ে।

আবার দেখো $x^2=4$ হলে আমরা x-এর দুইটা মান পাব! সেটার হিসাবটা করা হবে এভাবে—

$x^2=4$
$x^2=(\sqrt{4})^2$
$x^2-(\sqrt{4})^2=0$
$(x+\sqrt{4})(x-\sqrt{4})=0$
$x=\sqrt{4}$ অথবা $x=-\sqrt{4}$

$x=2$ অথবা $x=-2$

খেয়াল করো √4-এর মান কিন্তু শুধু ২-ই ব্যবহার করা হয়েছে!

√ প্রতীকটা কোথেকে এল?

তূর্য বান্টির দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, √ প্রতীকটা কোথেকে এসেছে জানো নাকি?

কোথেকে?

ইংরেজি আর লাতিনে এমন মূল বের করাকে বলে radix। বিখ্যাত গণিতবিদ লিওনার্দ অয়লারের মতে, এই √ প্রতীকটা এসেছে সে radix শব্দের প্রথম অক্ষর r থেকে!

এ সময় তন্বী তার ব্যাগ থেকে একটা বই বের করল। ওখানে লেখা আছে, কী করে দুই আর দুই পাঁচ প্রমাণ করা যায়! ও প্রমাণটার ঝামেলা কোথায় সেটা জানতে চাইল—

$$-২০ = -২০$$

$$১৬ - ৩৬ = ২৫ - ৪৫$$

$$১৬ - ৩৬ + (\frac{৮১}{৪}) = ২৫ - ৪৫ + (\frac{৮১}{৪})$$

$$৪^২ - ২ \times ৪ \times (\frac{৯}{২}) + (\frac{৯}{২})^২ = ৫^২ - ২\times৫\times(\frac{৯}{২}) + (\frac{৯}{২})^২$$

$$(৪ - \frac{৯}{২})^২ = (৫ - \frac{৯}{২})^২$$

$$(৪ - \frac{৯}{২}) = (৫ - \frac{৯}{২})$$

$$৪ = ৫$$

$$২ + ২ = ৫$$

ভাইয়া এখানে সমস্যাটা কোথায়?

তূর্য দেখিয়ে দিল, বর্গ যেখানে তুলে দেওয়া হয়েছে সেটা ভুল। $a^2=b^2$ হলেই $a=b$ হবে এটা সত্য না। যেমন $(-2)^2=2^2$ তার মানে এই না যে -২ আর ২ সমান। বর্গ তোলার সঠিক রীতি হলো পরমমান ব্যবহার করা। $a^2=b^2$ হলে $|a|=|b|$

$(৪ - \frac{৯}{২})^২ = (৫ - \frac{৯}{২})^২$ এর পরের লাইন হবে $|৪ - \frac{৯}{২}| = |৫ - \frac{৯}{২}|$ তাহলে ঠিক আছে। এখান থেকে পাবে, $|-\frac{১}{২}| = |\frac{১}{২}|$ বা, $\frac{১}{২} = \frac{১}{২}$, কোনো ঝামেলা নাই আর।

টিনা দুশ্চিন্তা নিয়ে বলল, ভাইয়া, আবার কি একটা ফাংশনের অঙ্ক দেখাতে পারি?

তূর্য রাগের মতো করে বলল, না, এতক্ষণ যখন ফাংশন পড়াচ্ছিলাম তখন কই ছিলে? এখন আর ফাংশন না। টিনা মন খারাপ করে মুখ নিচু করতেই তূর্য হেসে উঠল, আরে ধুর! মজা করলাম একটু। আমি কি নজিবুল্লাহ মাস্টার নাকি? মাথায় প্রশ্ন সব সময় নিয়ম ধরে আসে না। যখন যা মাথায় আসবে জিজ্ঞেস করতে থাকবে। কোনো অসুবিধা নাই।

টিনা যেন জানে পানি পেল, সেও বুঝতে পারছিল না, ভাইয়া হঠাৎ রাগবে কেন?

$f(x)= x^2$ কি এক-এক ফাংশন?

আমাদের বইয়ে $f(x) = x^2$-কে এক-এক ফাংশন হিসেবে দেখাতে বলা হয়েছে। প্রশ্নটা কি ঠিক?

এটি নির্ভর করবে ফাংশনটার ডোমেন কী দেওয়া আছে তার ওপর! তোমাদের তখন আমি বলেছিলাম রেঞ্জের কথা। আসলে একটা ফাংশন যখন সংজ্ঞায়িত করা হয়, তখন অনেক ক্ষেত্রেই তার ডোমেন দিয়েই দেওয়া থাকে। দেখবে এভাবে লেখা হয় প্রায়ই। f:R→R+, এ রকম থাকলে f দিয়ে বোঝায় ফাংশনটার নাম। এরপর তীর দিয়ে দেখানো হচ্ছে ফাংশনটা কোথা থেকে কোথায় 'ম্যাপ' হচ্ছে। তীরের আগেরটা হলো ডোমেন। পরেরটা কিন্তু রেঞ্জ না, সেটাকে বলে কোডোমেন।

পার্থক্যটা কী ভাইয়া?

কোডোমেন আর রেঞ্জের পার্থক্য কী?

কোডোমেনের ভেতর গণহারে সবাই থাকে, রেঞ্জ তার একটা উপসেট। যেমন ধরো, তোমার ক্লাসের সবার উচ্চতা। এটা কিন্তু একটা ফাংশন। সে ফাংশনটার ইনপুট হলে তোমরা, আউটপুট একেকটা সংখ্যা। ধরো ফাংশনটাকে এভাবে লিখলাম—

h:Student→R+

h(Mr. X)= height of Mr. X

দেখো এটার মানে হলো— এখানে ডোমেন হলো ছাত্রছাত্রীরা। আর h ফাংশনটা তাদের উচ্চতা বের করে। কোডোমেন R+ থেকে বোঝা যায় উচ্চতাটা হবে ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা। মানুষ যদি থাকে উচ্চতা নিশ্চয়ই শূন্য হবে না, ঋণাত্মক তো নয়ই। এই R+ কোডোমেনটা বলে উচ্চতার মান কেমন হবে। এখন বলো তো R+ এর ভেতরে কতগুলো বাস্তব সংখ্যা আছে?

'লাখ লাখ'

'কোটি কোটি'

'অসীম সংখ্যক'

'হ্যাঁ, এইবার ঠিক আছে। কিন্তু একটা ক্লাসে যদি ৪০ জন ছাত্রছাত্রী থাকে, উচ্চতা কত রকমের হতে পারে? সর্বোচ্চ ৪০ রকমের, তাই না? তার মানে এত যে ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা তারা সবাই কিন্তু এই ক্লাসের উচ্চতা না। উচ্চতাগুলোর সেট আসলে একটা ছোট্ট সেট, আর সেটা হলো R+ এর উপসেট। যেই সংখ্যাগুলো সত্যি সত্যি এই ক্লাসের উচ্চতা প্রকাশ করে, শুধু তারা হলো রেঞ্জ। আর রেঞ্জসহ বাকি সবাই হলো কো-ডোমেন।

তন্বী বলল, কিন্তু ভাইয়া, রেঞ্জ কি কো-ডোমেনের সমান হতে পারে না? মনে করেন—

$f:R+\rightarrow R+$

$f(x)=x^2$

এখানে কোডোমেনে যারা আছে তাদের প্রত্যেকেই তো ডোমেনের কোনো না কোনো সংখ্যার বর্গ? কোডোমেনের প্রত্যেককেই কখনো না কখনো আউটপুট হিসেবে পাওয়া যাবে।

সার্বিক ফাংশন কী?

একেবারে ঠিক কথা বলেছ! হতেই পারে! এ রকম যখন রেঞ্জ আর কোডোমেন সমান হয়ে যায় তখন ফাংশনটাকে বলে সার্বিক ফাংশন।

এবারে টিনা মুখ খুলল, ভাইয়া, আমার প্রশ্নটার তো উত্তর দিলেন না। $f(x)=x^2$ কি এক-এক?

হ্যাঁ এবার সেটাও বোঝাব। মনে আছে তোমাদের বলেছিলাম, ফাংশনে কোনো একটা ইনপুটের আউটপুট হবে শুধু একটা? কিন্তু অনেকগুলো ইনপুটের কিন্তু একই আউটপুট হতেই পারে। $f(x)=x^2$ এ রকম একটা ফাংশন। এখানে ২ দিলেও পাবে চার, -২ দিলেও চার। কিন্তু কিছু ফাংশন আছে যেগুলো আলাদা আলাদা মান দিলে তুমি সব সময় আলাদা মানই আউটপুট পাবে। যেমন $f(x)=x^3$, এখানে দুই দিলে পাবে আট। অন্য কোনো সংখ্যা ইনপুট দিয়ে তুমি আর আট পাবে না। একটার জন্য ঠিক একটা আউটপুট। এ রকম হলে তখন বলে এক-এক ফাংশন। যেমন $f(x)=x^3$ একটা এক এক ফাংশন এবং সাধারণভাবে চিন্তা করলে $f(x)=x^2$ এক এক ফাংশন নয়।

কিন্তু একটা ছোট্ট ফাঁকি রয়ে গেছে। ফাংশনটা কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা আছে, সেই ডোমেন আর কোডোমেন কিন্তু আমরা লিখিনি। খেয়াল করো, যদি আমরা এভাবে লিখি—

$f:R+\rightarrow R+$

$f(x)=x^2$

আমরা ডোমেনটা নির্ধারণ করে দিলাম শুধু ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা। এবারে কিন্তু তুমি ঋণাত্মক সংখ্যা দিতেই পারছ না। এবারে বর্গ সংখ্যা ৪ শুধু একভাবেই পাবে, ২ ইনপুট দিলে। তার মানে এভাবে সংজ্ঞায়িত করলে ঠিক একটার জন্য একটা মান পাওয়া যাবে।

গাণিতিকভাবে বললে, ডোমেইনের প্রতিটা ভিন্ন মানের জন্য ফাংশনের ভিন্ন ভিন্ন মান পাওয়া যাবে। তখন এটা এক এক ফাংশন হবে।

সবাই একটু সময় নিল ব্যাপারটা আরেকবার বুঝে নিতে।

পরের প্রশ্নটাও তন্বীর, ভাইয়া, অসীম আর শূন্য গুণ দিলে কী হয়?

তূর্য সংক্ষেপে বলল, এটা একটা অনির্ণেয় আকার।

অসীম আর শূন্য গুণ দিলে শূন্য হয় না কেন?

কেন, ভাইয়া? একটা শূন্য হোক আর এক শটা শূন্য হোক, সবই যদি শূন্য হয়, অসীম পরিমাণ শূন্যও কি শূন্যই হবে না? তাহলে অসীম গুণন শূন্য কেন শূন্য নয়? বেশি বাচ্চাদের মতো প্রশ্ন হচ্ছে? অসংজ্ঞায়িত, অনির্ণেয়— এগুলো প্যাঁচ খেয়ে যায়। একটু বোঝাবেন?

তূর্য বলল, আচ্ছা আগে অসীম আর শূন্যের গুণফলের ব্যাপারটা বলি। অসীম কিন্তু কোনো সংখ্যা নয়, এটা একটা গাণিতিক ধারণামাত্র। এটাকে দিয়ে সরাসরি গুণ ভাগ করা যায় না, লিমিটের ধারণা ব্যবহার করতে হয়! তোমাদের কি লিমিট বা সীমা সম্পর্কে ধারণা আছে? ওরা মাথা নাড়ল। এটা আছে এইচএসসিতে।

লিমিট জিনিসটা কী?

তূর্য ভাবল ওদের একটু ধারণা দেওয়া সম্ভব। ও বলল, ফাংশনে চলকের মান বসাতে থাকলে মাঝে মাঝে এমন কিছু সময় আসে, যখন তুমি বুঝবে কী আসতে যাচ্ছে, অথচ গণিত দিয়ে দেখাতে পারবে না। সেসব ক্ষেত্রে লিমিট দারুণ সহায়ক। একটা ফাংশন দেখাই তোমাদের—

$$f(x)=\frac{x^2-9}{x-3}$$

এই ফাংশনে x-এর মান ৩ হলে ফাংশনটার মান কত হবে? ৩ বসালে ওপরেও শূন্য এসে পড়ে, নিচেও শূন্য এসে পড়ে। ০/০-এর মান কত সেটা আমরা বলতে পারি না। কারণটা বোঝা কঠিন নয়। ১৫/৩ কথাটার মানে হলো ৩ কে কত দিয়ে গুণ করলে ১৫ হয়। কত দিয়ে?

৫ দিয়ে। তাহলে ১৫/৩=৫।

২৪/৪ মানে হলো ৪-কে কত দিয়ে গুণ দিলে ২৪ হয়। সেটা কত? ৬। তাহলে ২৪/৪=৬। তাহলে ০/০ মানে হলো ০-কে কত দিয়ে গুণ দিলে ০ হয়। এখন, ০-কে ১ দিয়ে গুণ করলেও ০ হয়, ২ দিয়ে গুণ করলেও শূন্য হয়, এমন ৩, ৪, ৫, ৬ যা দিয়েই গুণ করা যাক, শূন্যই হয়। তাহলে ০/০ এর মান ১, ২, ৩, ৪, ৫ ... সবকিছুই হতে পারে!

পৃথ্বী বলল, বাহ, ভালো তো!

অনির্ণেয় আকার কোনগুলো?

মোটেই ভালো না। তাহলে তো ০/০-এর মান কত আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারছি না। এমন ০/০ আকারকে বলে অনির্ণেয় (Indeterminate form)। এ রকম অনির্ণেয় আকার আরও বেশ কিছু আছে যেমন, 0^0, 1^∞, $\infty - \infty$, $\infty \div \infty$, $0 \times \infty$ এবং ∞^0। এরাও আসলে অনেক রকম মান দেয়। অনির্ণেয় আকারগুলোর বৈশিষ্ট্যই এটা— এরা অনেক প্রতিশ্রুতি দেয়, এই মান দেব, ওই মান দেব, সেইটা দেব।

রাজনীতিবিদদের মতো?

হা হা, অনেকটা ওরকমই। কিন্তু ফাংশনের কথা মনে করো, আউটপুট হতে হবে একটা, না হলে জিনিসটা সংজ্ঞায়িত হবে না। অনির্ণেয় আকারগুলোর সব কয়টা এ কারণে অসংজ্ঞায়িত।

তার মানে কি অনির্ণেয় মানেই অসংজ্ঞায়িত?

নাহ, অনির্ণেয়গুলোকে ভাবতে পারো অসংজ্ঞায়িতদের একটা উপসেট। অসংজ্ঞায়িত আকার আছে অজস্র। ১/০, ২/০, ০/০, $\log 0$, $\log_1 5$, এমন অনেকে আছে যারা সবাই অসংজ্ঞায়িত। তাদের ভেতর মাত্র সাতটা আছে, যারা অনির্ণেয়, এরা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একটু আগে তাদের সবার পরিচয়ই দিয়েছি। এরা একটু স্পেশাল কারণ লিমিট ব্যবহার করে অনেক সময়ই এদের ভেতর থেকে তথ্য পাওয়া যায়, এদের আসল মান কেমন সেটা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

যাহোক আমরা আমাদের ফাংশন $f(x)=(x^2-9)/(x-3)$-এর কাছে ফিরে যাই। আমরা দেখতে পেলাম x-এর মান যখন ৩, তখন এই ফাংশন আমাদের ০/০ এমন একটা অনির্ণেয় আকার দিচ্ছে। কিন্তু এটার মান কত হলে সবচেয়ে ভালো হতো সেটা কী চিন্তা করা যায়? চলো চেষ্টা করে দেখি। ৩ তো ইনপুট দিতে পারি না, ৩ এর খুব কাছাকছি কোন মান দিয়ে দেখি কত পাওয়া যায়। আমরা দেখি,

$f(2.999)=5.999$

$f(2.9999)=5.9999$

$f(3.001)=6.001$

$f(3.00001)=6.00001$

অর্থাৎ x-এর মান ৩-এর কাছাকাছি কিছু দিলে পুরো ফাংশনের মানটা ৬-এর কাছাকছি থাকছে! আমরা ৩ একটু আগে থেকে শুরু করে ২.৯৯৯, ২.৯৯৯৯ এভাবে যত ৩-এর দিকে আগাচ্ছি, পুরো ফাংশনের মানটা ৫.৯৯৯,৫.৯৯৯৯ এভাবে ৬-এর দিকে আগাচ্ছে। আবার ৩-এর একটু পর থেকে শুরু করেও যদি ৩.০০১, ৩.০০০০১ এভাবে আমরা একটু করে কমে কমে ৩-এর দিকে সরে আসি, পুরো ফাংশনের মানটা কমে কমে সেই ৬-এর দিকেই যাচ্ছে!

এখন আমরা বুঝতে পারছি x-এর মান ৩ হলে ফাংশনটার মান কত হওয়া উচিত ছিল। নিশ্চয়ই ৬। কিন্তু সেটা হতে পারছে না, কারণ ওপরে-নিচে শূন্য হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই যে আমরা বুঝতে পারছি যে এটা আর কেউ না ৬-এর দিকেই আগাচ্ছে, এটাকে তো গণিতবিদেরা অস্বীকার করতে পারেন না! তাই তারা নতুন এক গণিতের জন্ম দিলেন। আবিষ্কৃত হলো লিমিট।

এবার তারা লিখলেন এভাবে—

$$\lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = 6$$

এর মানে হলো x-এর মান যখন ৩-এর 'খুউউউব কাছাকাছি' পৌছাবে তখন $(x^2-9)/(x-3)$ ফাংশনটার মান যার 'খুউউউব কাছাকাছি' পৌছাবে সে হলো ৬। এ কথাটা খুব নিরাপদ কথা। আমরা জানি x-এর মান

সরাসরি ৩ দেওয়া যায় না, অনির্ণেয় হয়ে যায়। ৩-এর খুব কাছাকাছি দিতে তো আর আপত্তি নেই। অর্থাৎ ৩ হলে ফাংশনের মান কত হয়, সে বিতর্কে আমরা যাব না, আমরা ঘুরিয়ে খাব। বলব ইনপুট ৩-এর 'কাছে গেলে' ফাংশনের আউটপুট ৬-এর 'কাছে যাবে'।

অসীম কি কোনো সংখ্যা?

এবারে আমার মূল সমস্যায় আসি। অসীম আর শূন্যের গুণফল কীভাবে ভাবব? অসীম তো কোনো সংখ্যা না, এটা একটা ধারণা। এটা বিরাআআআট কিছু একটা। আমরা ঠিক অসীমে কখনো যেতে পারি না। বাস্তব সংখ্যার গণিতে কোনো চলকের মান অসীম বসালেই সবাই খেপে যাবে। কিন্তু... আমরা চলকের মান সরাসরি অসীম না বসিয়ে একটু ঘুরিয়ে খেতে পারি। লিমিট দিয়ে বলতে পারি অসীমের 'দিকে' গেলে কী হবে?

যদি n সংখ্যক শূন্য পাশাপাশি যোগ করা হয় তার মান কি শূন্য হবে? উত্তর হলো হ্যাঁ! এভাবে ভাবি—

$$\lim_{n\to\infty} n \times 0 = \lim_{n\to\infty} 0 = 0$$

যেহেতু n × ০ = ০, এবার $n \to \infty$ হলেও তার মান শূন্যই হবে। এখান থেকে তাকালে তোমার যুক্তিতে আসলেই কোনো ভুল নেই! মনে হবে

অসীম × ০ = ০;

সমস্যাটা কোথায়? সমস্যা হলো যুক্তি শুধু একটাই নয়! ধরা যাক, দুইটা ফাংশন আছে, $f(x)=1/(x+2)$, $g(x)=4(x+2)$; আমি প্রশ্ন করলাম— যখন $x \to \infty$ (এটাকে পড়া হয় x tends to infinity, মানে x যখন অসীমের খুব কাছে যায়), তখন ফাংশন দুইটার গুণফল $f(x) \cdot g(x) = ?$

$$\lim_{x\to\infty} f(x) \times g(x) = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x+2} \times 4(x+2) = ?$$

আলাদা করে তাকাও; x অসীমে গেলে $f(x)$ হবে শূন্য, হরে অসীমের মতো রাশি চলে আসা মানে বিরা-আ-আ-আ-ট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করার মতো, তাই মান হয়ে যাবে শূন্য।

x অসীমে গেলে $g(x)$ হবে অসীম; তার মানে শূন্য আর অসীমের গুণফলই আরেকবার আমাদের সামনে!

কিন্তু তুমি দেখো, x-এর যেকোনো মান $f(x)$ এবং $g(x)$ এ বসিয়ে গুণ করো, পাবে 4।

$$\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x+2} \times 4(x+2) = \lim_{x\to\infty} 4 = 4$$

x-এর মান যত বড়ই হোক, একই মান পাবে! তার মানে শূন্য আর অসীমের গুণফল 4। এই যুক্তিতেও ভুল নাই!

একইভাবে চিন্তা করো। আমি যেভাবে $g(x)$ ফাংশনটা বানিয়েছি সেখানে 4-এর জায়গায় ৫ থাকলে লিমিটের মান হতো ৫। বিভিন্ন ফাংশনের জন্য $x \to \infty$ তে এদের গুণফল যা খুশি তাই হতে পারে!

এ জন্যই $\infty \times 0$ (অসীম×শূন্য) একটা অনির্ণেয় আকার!

৫.৩

অসমতার সমস্যা

নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা চলল তারপর। একপর্যায়ে বান্টি প্রশ্ন করল অসমতা নিয়ে, ‘$x^2-5x+6>0$ এমন অসমতার সমাধান হলো $x<2$ বা $x>3$

এমন কোনো সংখ্যা কি বাস্তবে আছে— ২-এর ছোট, কিন্তু ৩-এর বড়?

'বা' কখন আর 'এবং' কখন?

তূর্য বলল, এখানে **বা** শব্দটা খেয়াল করো! বা-এর মানে হলো এই দুটো ঘটনা একসাথে ঘটবে না! আলাদা আলাদাভাবে সত্য হলেই চলবে! x-এর মান ২-এর থেকে ছোট হলেও চলবে, বা ৩-এর চেয়ে বড় হলেও চলবে! তোমার অসমতাকে এভাবে লেখা যায়— $(x-2)(x-3) > 0$

দেখো, গুণফল এখানে ধনাত্মক, তার মানে দুটো রাশিই ধনাত্মক বা দুটোই ঋণাত্মক হতে হবে!

যদি দুটোই ধনাত্মক হয়, আমরা পাব $x-2>0$ এবং $x-3>0$ $x>2$ এবং $x>3$

এমন সব x যারা একই সাথে ২-এর থেকেও বড় এবং ৩-এর চেয়েও বড় তারা হলো সমাধান! এমন কি x হতে পারে? পারে! ৫, ৬, ৭ এমন অসংখ্য সংখ্যা আছে যারা দুটো থেকেই বড়! একটু তাকালেই বুঝবে যারা ৩-এর চেয়ে বড়, তারা ২-এর থেকেও বড়! তার মানে ৩-এর থেকে বড় হলেই হবে!

এখান থেকে সমাধান পাব $x > 3$

যদি দুটোই ঋণাত্মক হয়, আমরা পাব $x-2<0$ এবং $x-3<0$ $x<2$ এবং $x<3$। এমন সব x যারা একই সাথে ২-এর থেকেও ছোট এবং ৩-এর চেয়েও ছোট তারা হলো সমাধান! এমনকি x হতে পারে? পারে! ০, ১, -১ এমন অসংখ্য সংখ্যা আছে যারা দুটো থেকেই ছোট! একটু তাকালেই বুঝবে যারা ২-এর চেয়ে ছোট, তারা ৩-এর থেকেও ছোট! তার মানে ২-এর থেকে ছোট হলেই হবে!

এখান থেকে সমাধান পাব $x < 2$

খেয়াল করো দুইটা আলাদা আলাদা কেস থেকে দুটো আলাদা সমাধান আমরা পাচ্ছি! এ জন্য এদের একসাথে 'এবং' দিয়ে লেখা হয় না, লেখা হয় or বা 'অথবা' দিয়ে!

এমনিতে এটা মনে রাখার একটা সহজ উপায় আছে। $(x-a)(x-b)$ এমন দুটো রাশির গুণফল >0 হলে সমাধান হয় 'ছোটটার চেয়েও ছোট অথবা বড়টার চেয়েও বড়'! আর <০ হলে, ছোটটার চেয়ে বড় এবং বড়টার চেয়ে ছোট।

দেখতে সহজ ভাবতে মজা সমস্যা

এবারে, ক্লাসের একটা সমস্যা বের করল তন্বী, $\frac{1}{1+x}>-1$ হলে x-এর মান কত? ক্লাসের অঙ্ক দেখাতে এখন ভালো লাগছিল না, তবে একটু দেখে তূর্য বলল, এটা আসলে একটা দারুণ সমস্যা! অনেক কিছু শেখার আছে! সমস্যাটা দেখলেই মনে হয় ব্যস্তকরণ করি, দুপাশ উল্টে দিয়ে অসমতার চিহ্ন বদলে দিই! তারপর সহজেই x-এর মান পাওয়া যাবে! কিন্তু আসলে সেটা করলেই বিপদ! ফল পাওয়া যাবে আংশিক।

অসমতায় ব্যস্তকরণ করলে কি সব সময় অসমতার চিহ্ন উল্টে যায়?

ব্যাপার হলো, অসমতায় ব্যস্তকরণ করলেই সব সময় চিহ্ন বদলায় না! ধরা যাক, ৩> ২, ব্যস্তকরণ করে চিহ্ন উল্টালে পাব ১/৩ < ১/২; এটাতে সমস্যা নেই।

কিন্তু যদি ৩> -২ নিয়ে ভাবি, উল্টালে পাব ১/৩ <-১/২, এটা কিন্তু ভুল হয়ে গেল!

আসলে এটা হবে ১/৩ > -১/২, অর্থাৎ একপাশে যদি ধনাত্মক রাশি থাকে আর আরেকপাশে ঋণাত্মক, তাহলে যতই ব্যস্ত করি ধনাত্মক রাশি ঋণাত্মকের থেকে বড়ই থেকে যাবে। ফলে দুই পাশে দুই চিহ্ন থাকলে ব্যস্ত করলেও অসমতার চিহ্ন পাল্টাবে না।

এবার মূল সমস্যা

$1/(1+x) > -1$

ডান পাশে তো দেখাই যাচ্ছে ঋণাত্মক রাশি। আমরা যদি উল্টাতে চাই আমাদের জানতে হবে— বাম পাশেরটা কেমন।

যেহেতু এখানে চলক x আছে, আমাদের পক্ষে সরাসরি সেটা জানা সম্ভব নয়। তাই দুইটা কেইস আলাদা করে ভাবতে হবে। যখন $(1+x)$ ধনাত্মক আর যখন $(1+x)$ ঋণাত্মক।

প্রথমে ধরি $1+x$ ধনাত্মক, বা $1+x >0$, বা, $x > -1$

তাহলে মূল অসমতার বামে ধনাত্মক ডানে ঋণাত্মক, দুই পাশে দুই চিহ্নের লোক! এ অবস্থায় ব্যস্ত করলে চিহ্ন পাল্টাবে না! পাওয়া যাবে

$1+x > -1$ বা, $x > -2$

কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমরা ধরেই নিয়েছি $x>-1$

তার মানে x হবে এমন সব সংখ্যা যারা -১-এর চেয়েও বড়, -২-এর চেয়েও বড়! এমন সংখ্যা কারা? খেয়াল করি, -১ আর -২-এর মধ্যে -১ বড়! যারা বড়টার চেয়েও বড় তারা সবাই অন্যটার থেকে আপনাআপনিই বড় হবে! ফলে, শুধু $x>-1$ বললেই চলবে। এখান

থেকে সমাধান পেলাম $x > -1$

এবার ধরি $1+x$ ঋণাত্মক, বা $1+x < 0$, বা, $x < -1$

তাহলে বামে-ডানে দুই পাশেই ঋণাত্মক, দুই পাশে একই চিহ্নের লোক! এ অবস্থায় ব্যস্ত করলে চিহ্ন পাল্টাবে! পাওয়া যাবে $1+x < -1$ বা, $x < -2$

কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমরা ধরেই নিয়েছি $x<-1$

তার মানে x হবে এমন সব সংখ্যা যারা -২-এর চেয়েও ছোট, -১-এর চেয়েও ছোট! এমন সংখ্যা কারা? -১ আর -২-এর মধ্যে -২ ছোট! যারা ছোটটার চেয়েও ছোট তারা সবাই অন্যটার থেকে আপনা-আপনিই ছোট হবে! ফলে শুধু $x<-2$ হলেই চলবে! এখান থেকে সমাধান আসবে $x < -2$

তার মানে পূর্ণ সমাধান হবে : $x<-2$ বা $x>-1$'

তূর্য এটুকু বলে সবার দিকে তাকায়। সবাই এখনো উজ্জীবিত।

চোখের ক্ষেত্রফল

ঠিক আছে, আজকে আর না, তোমরা বাসায় যাও। যাওয়ার সময় বাক্সের তলাটা দেখতে ভুলো না।

কেউই ভুলত না। প্রতিদিন ফেরার সময় একটা করে সমস্যা নিয়ে যাওয়াটা ওদের একরকম রেওয়াজ হয়ে গেছে। ভাইয়া উত্তরও বলে দেয় না, শুধু বলে উত্তর হলে তুমি নিজেই অনুভব করতে পারবে!

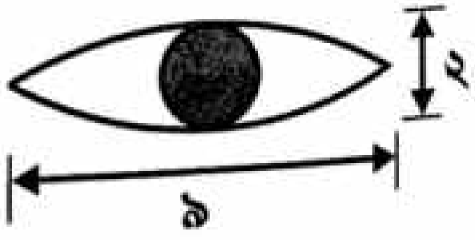

বাসায় এসে কাগজ খুলে তন্বী দেখে একটা ছবি আঁকা, যেটা দেখতে একটা চোখের মতো। চোখের সাদা অংশের ক্ষেত্রফল বের করতে হবে!

বৃত্ত ছিল চোখের মণি— সীমানা বৃত্তচাপ
ছবিতে তাকাও, জানতে পারবে কার কোন পরিমাপ
চিন্তা করবে ধী-রে বৎস, পিথাগোরাসের মতো—
বলো তো, চোখের সাদা অংশের ক্ষেত্রফলটা কত?

এটা বেশ কঠিন সমস্যা, তবে ওরা সমাধান করতে পারলে মজা পাবে!

অধ্যায় ৬

জ্যামিতির জমজমাট জল্পনা

৬.১

এ শহরে যে অল্পকটা বহুতল ভবন আছে, তারই একটার পাশ দিয়ে হাঁটছিল তূর্য। এটার মালিক ছিলেন বিরাট ধনাঢ্য এক ব্যবসায়ী। লোকটা মারা গেছেন এক মাস আগে। তূর্য ভাবছে এই লোকটা পৃথিবীতে আসলে কী রেখে গেলেন! কোনো নতুন পরমাণু তিনি তৈরি করেননি, ধ্বংসও করেননি, যা ছিল তা-ই আছে। তূর্যের মনে হয়, আমরা যা রেখে যেতে পারি সেটা হলো আইডিয়া, চিন্তা। ভাবনাগুলোই আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ!

তূর্য ডুবে যায় ভাবালুতায়— ওর চোখ দুটো যেন সামনের মানুষগুলোকে দেখতে পায় না আর। ও দেখে ভবিষ্যৎ। ও মোহগ্রস্ত মানুষের মতো হাঁটতে হাঁটতে ভাবে— একদিন এই ইট-কাঠের পৃথিবী থেকেও আরও বড় একটা অস্তিত্ব থাকবে মানুষের। একটা ভার্চ্যুয়াল জগতে সবাই ঘুরে বেড়াবে। ইন্টারনেটের মধ্য দিয়ে মানুষ সত্যি সত্যি ঢুকে যাবে একটা কাল্পনিক সত্তার ভেতরে। সেখানে শিল্পী-স্থপতিরা ইমারত বানাবে, সে ইমারত বানানোর জন্য বাস্তব পৃথিবীর কোনো বাধাই আর বাধা রইবে না। সেখানে আইনকানুন থাকবে। সেই পৃথিবীতে মানুষ জমির মতো বিক্রি করবে কো-অর্ডিনেট। পৃথিবীজুড়ে কোটি কোটি কম্পিউটার, ডাটা সেন্টার সেই জগৎটা বাঁচিয়ে রাখবে। সব সম্ভব হবে গণিতের শক্তিতে!

৬.২

আজকে নজিবুল্লাহ স্যার বান্টিকে আবার অপমান করেছেন। বান্টি একটা উপপাদ্য ঠিক বইয়ের ভাষায় বলতে পারেনি। তাতেই প্রচণ্ড খেপে গিয়ে ওকে বলেছেন স্যার, 'এটা কি তোর বাবার লেখা যে যা ইচ্ছা তা-ই বলবি?' এরপর অনেকক্ষণ ধরে তোতাপাখির মতো করে মুখস্থ করিয়েছেন উপপাদ্যটা। এই কাহিনি শুনে স্যারের মুখোমুখি হওয়ার ইচ্ছেটা আবার তীব্র হয় তূর্যের। সম্প্রতি বিতর্ক ক্লাবে নাম লিখিয়েছে, তা ছাড়া সারা দেশে অলিম্পিয়াডের সময় নজিবুল্লাহ স্যারদের মতো মানুষদের কাছে প্রায়ই যেতে হয়। 'ওনার সাথে কথা বলতে ভয় পাওয়ার কিছুই নাই আমার,' তূর্য ভাবে।

৬.৩

তূর্য আজকে জ্যামিতি পড়াবে ভেবেছিল। আগের দিনই বান্টিরা জানিয়েছিল যে ওদের অনুশীলনীর এক্সট্রাগুলোতে সমস্যা আছে, দেখিয়ে দিতে হবে। আলোচনার শুরুতে তূর্য বলল জ্যামিতির শুরুর কথা। জ্যামিতির শুরু কি আজকের কথা! খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে প্রাচীন মিসরের মানুষ যে জ্যামিতি ব্যবহার করত তার নিদর্শন মেলে। জ্যামিতির জ্ঞান না থাকলে অত বড় পিরামিড বানানো ওদের পক্ষে সম্ভব হতো না।

জ্যামিতির শুরু কোথায়?

বাংলায় যে আমরা বলি 'জ্যা' মানে ভূমি আর 'মিতি' মানে পরিমাপ— এই ভূমি পরিমাপের কাজেরও নিদর্শন পাওয়া যায় মিসরে— নীল নদের অববাহিকায় গড়ে ওঠা প্রাচীন সভ্যতায়। মিসরের উত্তরে ছিল ভূমধ্যসাগর, সেটা পাড়ি দিয়ে যাওয়া যেত গ্রিসে। তাদের ভেতর ছিল বাণিজ্যিক যোগাযোগ। বাণিজ্যের পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদানপ্রদানও ঘটত নিয়মিত। মিসরীয়দের পরে জ্যামিতির বিকাশে গ্রিকদের ভূমিকা অনেক। মহান দার্শনিক প্লেটো একটা দর্শনের বিদ্যালয় খুলেছিলেন, নাম ছিল 'একাডেমি'। সেখানে দরজায় বড় করে লেখা ছিল, 'যে লোক জ্যামিতি জানে না, সে যেন এই দরজা দিয়ে না ঢোকে!'

বান্টি বলল, ব্যাপক তো! অনেকটা অ্যাডমিশন টেস্টের মতো মনে হচ্ছে।

আসলেই তা-ই। বোঝো, তারা জ্যামিতিকে কী সম্মান করত! অবশ্য প্লেটোরও দেড় শ বছর আগে গ্রিসের সামোস দ্বীপে জন্মেছিলেন মহান পিথাগোরাস। তার উপপাদ্য তোমরা এখন পড়ো। পিথাগোরাস লোকটা বেশ রহস্যময় ছিলেন। ওনাকে নিয়ে নানা গল্প প্রচলিত আছে, তবে জ্যামিতিতে তার আসলেই বড় কোনো অবদান আছে কি না, এটা নিয়ে অনেকের সন্দেহ আছে!

বলেন কী?

তবু ইতিহাস তাকে অনেক সম্মান করে, তাকে বলা হয় প্রথম প্রকৃত গণিতবিদ।[২] তবে যদি প্রাচীন গণিত নিয়ে বলতি হয় দুটো নাম অবধারিতভাবে চলে আসবে— প্রথমত 'ইউক্লিড' যার লেখা তেরো খণ্ডের এলিমেন্টস বইটিকে বলে গণিতের ধর্মগ্রন্থ। উনি যখন বইটা লেখেন সেই সময়ে জ্যামিতি আর সংখ্যাতত্ত্বের যত জ্ঞান ছিল, সব তিনি একসাথে সংকলন করেন। তাকে বলা হয় 'জ্যামিতির জনক'।

আর আরেকজন?

আরেকজন হলেন আর্কিমিডিস, তাকে বলা হয় মানব ইতিহাসের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ তিন গণিতবিদের একজন।

বাকি দুজন কারা?

কার্ল ফ্রেড্রিখ গাউস আর আইজ্যাক নিউটন। যাহোক ইউক্লিডের কথায় ফিরি। তোমরা তোমাদের ক্লাসে যত জ্যামিতির উপপাদ্য শেখো সবই তার এলিমেন্টস বইটা থেকে নেওয়া।

তূর্য একটু উদাস হয়ে বলল, কী অসাধারণ ব্যাপার চিন্তা করতে পারো? আড়াই হাজার বছর আগে লেখা একটা বই এখনো মানুষ ব্যবহার করছে। এটা গণিতের একটা দারুণ ব্যাপার। একবার যে উপপাদ্য

---

[২] লেখক পিথাগোরাসের মহাভক্ত। তার জীবন আর উপপাদ্য নিয়ে কিছু মজার তথ্য পাওয়া যাবে এই লেখকের লেখা আরেকটি বই 'গণিতের রঙ্গে : হাসিখুশি গণিত' এ।

সত্য প্রমাণিত হবে, তা যুগের পর যুগ সত্য থাকবে; মহাবিশ্বের যেই প্রান্তেই যাও সব জায়গায় সত্য থাকবে।[৩]

এটা বলে তূর্য ওদের বইটা নিয়ে বলল, দেখো, ইউক্লিড কী সুন্দর করে সাজিয়েছেন গণিতের সমস্ত জ্ঞানকে। প্রথমে বিন্দু, রেখা এসবের সংজ্ঞা দিয়েছেন। বাস্তব জীবনের পর্যবেক্ষণ থেকে কিছু ব্যাপার সত্য ধরে নিয়েছেন, যাদের বলেছেন স্বীকার্য আর স্বতঃসিদ্ধান্ত (Axioms and Postulate)। এরপর সেগুলো সত্যি ধরে প্রমাণ করেছেন নানান সব উপপাদ্য, কত গোছানো কাজ!

এবারে পৃথ্বী হঠাৎ প্রশ্ন করল, ভাইয়া, গণিতের বিন্দুর সংজ্ঞা হিসেবে আমরা শিখেছি, যার দৈর্ঘ্য নেই, প্রস্থ নেই, উচ্চতাও নেই, শুধু অবস্থান আছে তাকে বিন্দু বলা হয়।

এটা আবার কী রকম? দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা ছাড়া তো অবস্থান হয় কী করে?

বিন্দু কী জিনিস?

তূর্য বলল, তুমি ঠিক আছ, খেয়াল করো, বিন্দুর ওই সংজ্ঞাটা ইউক্লিড দিয়েছিলেন এখন থেকে আড়াই হাজার বছর আগে। এটা আর গ্রহণযোগ্য নয় বর্তমান গণিতে। এখন আর এটাকে অন্যকিছু দিয়ে সংজ্ঞা দেওয়া হয় না; বরং একটা প্রাথমিক ধারণা বা **Primitive Notion** হিসেবে ধরা হয়, যাকে আগের কোনো কিছু দিয়ে সংজ্ঞা দেওয়া যাবে না। বিন্দু হলো স্পেস বা 'স্থান' নামক সেটের একটি উপাদান।

মোটা মার্কার, ০.৫ মিমি কলম নাকি সূক্ষ্ম পেনসিলে আঁকা বিন্দু?

ভাইয়া, বিন্দু তো কেবল একটা অবস্থান নির্দেশ করে। কিন্তু আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে এটার কি এমন কোনো পরিমাপ আছে যার ভিত্তিতে আমরা একটা অবস্থান কে বিন্দু বলব। মনে করেন, আমি বিন্দু আঁকতে চাই। বল পয়েন্টের বিন্দু থেকে মার্কার পেনের বিন্দু অনেক বড়। এরপরও মার্কার পেনে আঁকা বিন্দুকেও কিন্তু বিন্দুই বলছি। আকার আকৃতি চিন্তা করলে সেই মার্কার পেনের বিন্দুতে অনেকগুলো বল পয়েন্টের বিন্দু পাওয়া যাবে। তাহলে কত ছোট হলে বিন্দু বলতে পারব?

---

[৩] এটা সত্যি থাকবে যদি একই 'এক্সিওমেটিক সিস্টেম' হয়। সমতলে পিথাগোরাসের উপপাদ্য সবসময় খাটবে। আধুনিক জ্যামিতিতে উপবৃত্তীয়, অধিবৃত্তীয় তল আছে। সেখানে সরাসরি এটা সত্য নাও হতে পারে।

বিন্দু, রেখা, বৃত্ত কি আসলে আঁকা যায়?

তোমার চিন্তাটা খুবই যুক্তিযুক্ত। তবে আমার উত্তরটা মনে হয় তোমাদের ভালো লাগবে না। সত্যি হলো জ্যামিতির কোনো চিত্র কোনো দিন আঁকা যায় না। একটা বৃত্ত আঁকা যায় না, রেখা যায় না, বিন্দু আঁকা যায় না। আমরা যেগুলো আঁকি, এগুলো প্রতীকমাত্র, তবে প্রতীকগুলো এমনি এমনি না।

ছবি 'আঁকি' না ছবি 'লিখি'?

আসল রূপটা কেমন তার একটা মোটাদাগের অনুমান এই ছবিগুলো। একটা বৃত্তের কথা ভাবো। কেন্দ্র থেকে পরিধির সবগুলো বিন্দুর দূরত্ব সমান হওয়ার কথা। কিন্তু তুমি যখন আঁকছ, পরিধির দাগটার তো কিছু হলেও প্রস্থ থাকবে। যত মোটা কালিতে আঁকবে, প্রস্থ তত বেশি। তাহলে ভাবো কেন্দ্র থেকে এই দাগের বাইরের বিন্দুটার দূরত্ব আর কেন্দ্র থেকে এই দাগের ভেতরের বিন্দুর দূরত্ব কি একই হবে? হবে না। কালি যত সূক্ষ্ম হবে, তত নিখুঁত হবে ছবি।

তবে চিন্তা করা যায় আসল যে বৃত্ত সেটা দেখতে এমন গোলজাতীয়ই হবে। ফলে আমাদের চিন্তার সাহায্যকারী হিসেবে এই ছবিগুলোর দাম আছে।

তাহলে ভাইয়া, এত উপপাদ্য, সম্পাদ্য সব অনুমানের ওপর নির্ভরশীল?

না, না, গণিতের কিছুই শুধু অনুমানের ওপর নির্ভরশীল নয়! আধুনিক জ্যামিতিতে ছবি কোনো ব্যাপারই না! একেকটা জ্যামিতিক চিত্র হলো একেকটা সেট, সেই সেটের উপাদান হলো বিন্দু। আধুনিক উপায়ে হয়তো ৫ একক ব্যাসার্ধের একটা বৃত্ত আঁকা হবে এভাবে—

$$\{x, y \in R: x^2+y^2 = 5^2\}$$

এতক্ষণ তো ছককাগজ দেখেছ তাই না?

হ্যাঁ, ভাইয়া

'x আর y-এর কোন কোন মান নিলে ওপরের সমীকরণটা ঠিক থাকে, অমন এক শটা বিন্দু খুঁজে বের করো। যেমন একটা হতে পারে x=3, y=4। আরেকটা হতে পারে x=0, y=5 -এ রকম। এদের সবাইকে ছককাগজে বসালে একটা নিখুঁত বৃত্ত পাওয়া যাবে। দেখেছ, আমরা একটা সমীকরণ লিখে বৃত্ত বুঝিয়ে ফেললাম। এখানে বৃত্ত ঠিক আঁকা হলো না; বরং লেখা হলো।

প্রশ্ন আর চিন্তা ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত। কী থেকে যে কী মনে পড়ে! ছককাগজে লেখচিত্র আঁকার কথা শুনে বান্টির মনে প্রশ্ন জাগল, আচ্ছা ভাইয়া, x অক্ষকেই কেন স্বাধীন ধরা হয়? আমাদের শিখিয়েছে x হলো স্বাধীন চলক আর y হলো অধীন। উল্টোটা হলে সমস্যা কী ছিল?

x অক্ষকেই কেন স্বাধীন ধরা হয়?

তূর্য বলল, x অক্ষকেই স্বাধীন ধরতে হবে, এটা কোনো বাধ্যতামূলক ব্যাপার না। তুমি চাইলে x অক্ষকে ওপর থেকে নিচে কিংবা কোনাকুনি করেও বসাতে পারো, সে ক্ষেত্রে y অক্ষকে তার সাথে সমকোণে রাখলেই চলবে।

গণিতে বা বিজ্ঞানে যখন এমন কিছু সামনে চলে আসে, যেটাকে অনেকভাবে দেখা বা লেখা সম্ভব, তখন সবাই চেষ্টা করে কোনো একটাকে নির্দিষ্ট করতে, যেন সবাই সহজে বুঝতে পারে। এ ব্যাপারটাকে বলে 'রীতি' বা 'কনভেনশন'। ধরো, এই যে '+'- এটাকে আমরা এখন বলি প্লাস চিহ্ন। আজ থেকে মাত্র কয়েক শ বছর আগেও কিন্তু এই চিহ্ন ছিল না। ইউরোপে সবাই P দিয়ে প্লাস বোঝাত। ভারতীয় উপমহাদেশে ছিল অন্য প্রতীক। এখন সবাই '+' এটাকে প্লাস চিহ্ন হিসেবে জানে। এটাও একটা রীতি। P দিয়ে লিখলে গণিতের হিসাবে কোনো ভুল হতো না।

আবার x অক্ষের প্রসঙ্গে যাই। এখন আমরা চিন্তা করতে পারি, কেন এটাকেই সবাই রীতি হিসেবে ধরল। সেটার জন্য সম্ভবত আমাদের সভ্যতার বিকাশ নিয়ে ভাবতে হবে। চাইনিজ, জাপানিজ ভাষার মতো কিছু ভাষা বাদে অধিকাংশ ভাষাতেই অনুভূমিকভাবে অক্ষরগুলো লেখা হতো এবং আরবি, ফারসি, হিব্রু এমন কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে অধিকাংশ ভাষা বাম থেকে ডানে লেখা হয়। এমনকি তারও আগে, অধিকাংশ সভ্যতাতে যখন ছবি আঁকা হতো, বাম থেকে ধীরে ধীরে ডানে যাওয়াটা সময়ের সাথে এগিয়ে যাওয়া চিন্তা করা হতো।

পরিবর্তন চিন্তা করলে এখনো মাথায় প্রথম আসে সময়ের সাথে কোন জিনিস কীভাবে বদলাচ্ছে। সময়কে অনুভূমিক অক্ষে রেখে পরিবর্তন চিন্তা করাটায় আমাদের একধরনের অভ্যস্ততা চলে এসেছে। আমার ধারণা এ কারণে অনুভূমিক অক্ষে স্বাধীন চলক রাখার ব্যাপারটা সবাই সহজে মেনে নিয়েছে।

পিথাগোরাসের উপপাদ্য কী কাজে লাগে?

এবার টিনা জিজ্ঞেস করল, ভাইয়া, একটু আগে উপপাদ্যের কথা বলছিলেন, তখন মনে হলো, এই যে পিথাগোরাসের সূত্র মানে, অতিভুজ^{২}=ভূমি^{২} + লম্ব^{২}

এই সূত্র বর্তমান বাস্তবজীবনে আমাদের কী কাজে লাগে? আর তৎকালীন সময়ে এই সূত্রের কাজ কী ছিল?

নয় ভুজের ক্ষেত্রফল কীভাবে বের করা যাবে?

তূর্য বলল, দেখো, এটা পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে কাজের সূত্রগুলোর একটা। সেই কালে ক্ষেত্রফল মাপা, সমকোণ তৈরিতে এটা ব্যবহার হতো। ধরা যাক একটা জমি আছে, যেটা দেখতে আঁকাবাঁকা ৯ ভুজের মতো। তার ক্ষেত্রফল কীভাবে মাপব? এটাকে ৭টা ত্রিভুজে ভাগ করে নেওয়া হবে, এরপর ত্রিভুজগুলোর বাহুর দৈর্ঘ্য জানলেই হেরনের সূত্র দিয়ে সব কটার ক্ষেত্রফল জানা যাবে। তিন বাহু জানলে ক্ষেত্রফল বের করার যায় হেরনের সূত্র দিয়ে $\sqrt{\{s(s-a)(s-b)(s-c)\}}$, যেখানে s হলো অর্ধ পরিসীমা, বা তিন বাহুর যোগফলের অর্ধেক। এই সূত্রটা বের করতে গেলেও লাগবে পিথাগোরাস।

স্থানাঙ্কের দূরত্ব

এই উপপাদ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হলো স্থানাঙ্ক জ্যামিতিতে। ধরো একটা বিন্দুর ভুজ কোটি (১,৩), আরেকটার (৫,৬)। তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত আমরা জানতে চাই। ছবিতে দেখো, তাদের দিয়ে সহজেই একটা সমকোণী ত্রিভুজ ভাবা যায়। তার ভূমি (৫-১)=৪ একক, আর লম্ব (৬-৩)=৩ একক। পিথাগোরাস থেকে সহজেই পাওয়া যায় অতিভুজ= $\sqrt{(৪^{২}+৩^{২})}$=৫। এটাই তাদের ভেতর দূরত্ব। সাধারণ সূত্র দিয়ে বললে এভাবে বলা যায়, দুটো বিন্দুর ভেতর দূরত্ব = √(ভুজদ্বয়ের অন্তর²+কোটিদ্বয়ের অন্তর²)।

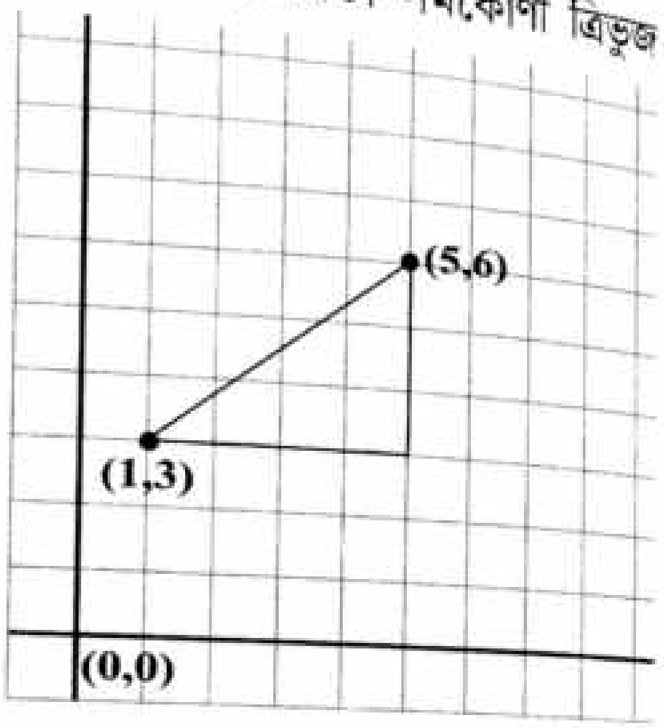

আসলে, বিজ্ঞানের এমন কোনো শাখা নেই, যেখানে এটা ব্যবহার হয় না। পিথাগোরাসের সূত্রের একটা ত্রিকোণমিতিক রূপ আছে, যেটা তোমরা নিশ্চয়ই জানো $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$, এটা ছাড়া কোনো প্রকৌশল চলে না।

পিথাগোরাস দিয়ে আইনস্টাইনের সূত্র

আর যদি আধুনিক বিজ্ঞানের কথা বলো— পিথাগোরাসের সূত্র ব্যবহার করে এমনকি আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতার সময় সম্প্রসারণও প্রমাণ করে ফেলা যায় মাত্র কয়েক লাইনে! এটা দিয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন, আইনস্টাইন বলেছিলেন চলন্ত ঘড়ি ধীরে চলে। দাঁড়াও, তোমাদের এটা শিখিয়ে দিই। বলে সে খাতায় একটা ছবি আঁকল। মনে করো,

একটা ট্রেন, দুইটা লোক। একজন ভেতরে অন্যজন বাইরে। দুজনই সময়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব করতে পারে। জেনে রাখো—

দূরত্ব = বেগ × সময়।

ভেতরের লোক একটা টর্চ জ্বালল। সে দেখল আলো t সময় পরে সোজা মেঝেতে পৌছাল। আলোর বেগকে c দিয়ে লেখা হয়। তাহলে টর্চ থেকে মেঝের দূরত্ব হবে 'বেগ গুণন সময়' মানে ct।

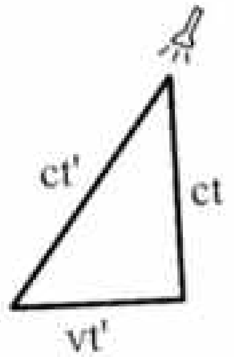

বাইরের লোকটা দেখছিল ট্রেনটা v বেগে গতিশীল। সে দেখল টর্চের আলো t' সময় পরে ct' দূরত্ব অতিক্রম করে মেঝেতে পৌছাল। এই সময়ে ট্রেনটা vt' দূরত্ব অতিক্রম করল। এখন পিথাগোরাসের সূত্র থেকে পাব—

$$(ct')^2=(ct)^2+(vt')^2 \text{ বা, } c^2t'^2=c^2t^2+v^2t'^2$$

$$t'^2=t^2+\frac{v^2}{c^2}t'^2$$

$$t'^2-\frac{v^2}{c^2}t'^2=t^2$$

$$t'^2\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)=t^2$$

$$t'^2=\frac{t^2}{(1-\frac{v^2}{c^2})} \text{ বা, } t'=\frac{t}{\sqrt{(1-\frac{v^2}{c^2})}}$$

পিথাগোরাস থেকে টুইন প্যারাডক্স

এটা দেখতে তেমন কঠিন কিছু না। কিন্তু এর ফলাফল ভয়াবহ। মনে কর, ট্রেনের জায়গায় আছে একটা মহাকাশযান যেটা দুরন্ত গতিতে চলতে পারে। আলোর গতির শতকরা ৮০ ভাগ গতিতে। তাহলে $v/c=0.8$ । এখন ধরো, তোমার এক যমজ ভাই তোমাকে পৃথিবীতে রেখে ওই মহাকাশযানে করে মহাশূন্যে ঘুরতে গেল, আবার একই বেগে ফিরেও এল। সে মহাকাশযানের ভেতরে হিসাব করে দেখল ৬ বছর কাটিয়েছে। তুমি পৃথিবী থেকে সময়টা কেমন দেখবে? ওই সূত্রে বসালে পাব

$$t'=\frac{t}{\sqrt{(1-\frac{v^2}{c^2})}}=\frac{6}{\sqrt{(1-0.8^2)}}=10 \text{ বছর।}$$

অর্থাৎ তার যখন বয়স বাড়বে ৬, তোমার বাড়বে ১০। কী অদ্ভুত কথা, তাই না?

এবার শুধু পৃথ্বী নয়, বাকিরাও হা হয়ে গেল। এও কী সম্ভব?

আয়ত, বর্গ, রম্বস : মিল-অমিল

বেশ কিছুক্ষণ শান্ত থাকল সবাই। এরপর পৃথ্বী একটা ছেলেমানুষি প্রশ্ন করল তবু কেউ ওকে আটকাল না। ওরা জানে চাইলে সব প্রশ্ন থেকেই শেখা যায়। ভাইয়া, বর্গকে কি আয়ত বলা যাবে? আয়তের সব শর্ত বর্গের মধ্যে রয়েছে।

হ্যাঁ, প্রতিটা বর্গই আয়ত! যে আয়তর সন্নিহিত বাহু সমান সেটাই বর্গ!

তাহলে বর্গের কর্ণদ্বয় পরস্পর কেন সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে না?

কে বলল করে না! করে তো! কারণ প্রতিটা বর্গই একেকটা রম্বস?

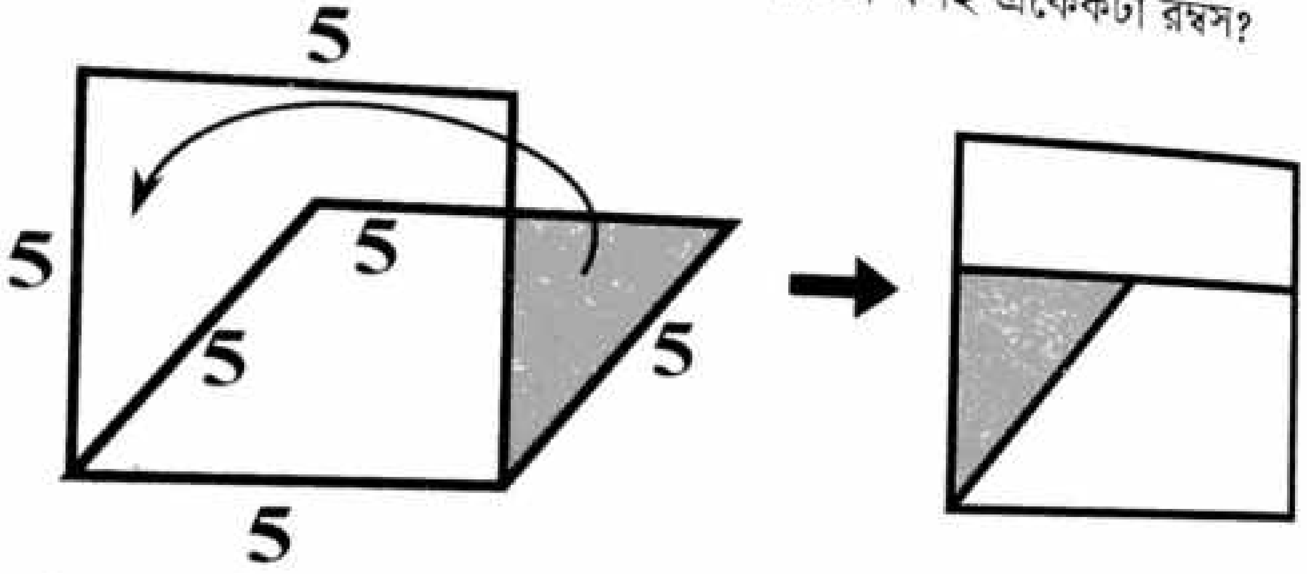

ভাইয়া, আমি বুঝি না— ৫ সেমি বাহুবিশিষ্ট বর্গের ক্ষেত্রফল এবং একই মাপের অর্থাৎ ৫ সেমি বাহুবিশিষ্ট রম্বসের ক্ষেত্রফল একই হয় না কেন? একইভাবে সামান্তরিক এবং আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ও কেন একই হয় না?

তূর্য একটা ছবি এঁকে বোঝাল ব্যাপারটা। উচ্চতা বিষয়টা এখানে জরুরি। বাহু সমান রাখতে গিয়ে রম্বসের উচ্চতা যায় কমে। ফলে ক্ষেত্রফল কমে যায়। দেখো, ছবিতে একই ভূমির ওপরে একটা বর্গ আরেকটা রম্বস এঁকেছি। রম্বসের গাঢ় করা অংশটা কেটে সামনে বসিয়ে দিলে পাওয়া যাবে একটা আয়তক্ষেত্র। দেখতেই পাচ্ছ সেটা মূল বর্গ থেকে ছোট!

ভাইয়া, এবার পাই নিয়ে কিছু বলেন। পাই-এর মান বের করার আসল ফর্মুলাটা কী? ২২÷৭ দিলে যেটা আসে, ওইটা পৌনঃপুনিক হয়ে যায়...।

২২/৭ কি পাই?

২২/৭-এর আনন্দটা কী রকম?

তূর্য বলল, ২২÷৭ পাই-এর একটা অনুমানমাত্র। আসল ফর্মুলা হলো, পাই = পরিধি/ ব্যাস ☺। তবে মান বের করার জন্য অনেক অসীম ধারা আছে। সেগুলোর ভেতর সবচেয়ে সহজ আর সবচেয়ে কম কাজের ধারা হলো—

$$\pi = 4\left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots\right)$$

এটা দেখতে সহজ হলেও বেশি কাজের না, অনেকগুলো পদ নিলে তবে গিয়ে অল্প কয়েক ঘর মান ঠিকঠাক পাওয়া যায়। আরও অনেক ধারা আছে, যেগুলো খুব কাজের। আরেকটা কথা— ২২÷৭-কে অনেকেই বলে 'পাই'। আসলে এটা পাই না, পাই-এর খুব কাছাকাছি একটা মান!

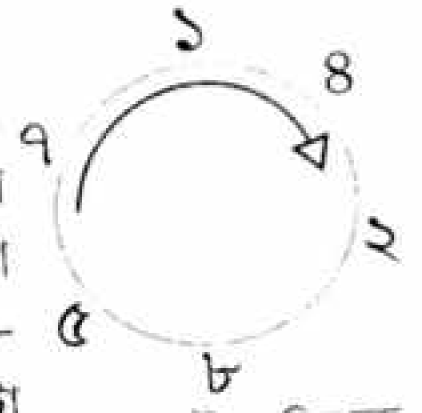

৭ এর পৌনঃপুনিক চক্র

২২÷৭ নিজেও কিন্তু কম আনন্দময় নয়। এর মান দশমিকের পর অনেক দূর বের করে দেখো— ৩.১৪২৮৫৭ ১৪২৮৫৭ ১৪২৮৫৭ ১৪২৮৫৭ ১৪২৮৫৭... বাহ, ১৪২৮৫৭ এই অংশটুকু বারবার ফিরে আসছে— পৌনঃপুনিক।

এবার ২৩÷৭-এর মান দেখি ৩.২৮৫৭১৪ ২৮৫৭১৪ ২৮৫৭ ১৪ ২৮৫৭১৪... এবার কেমন একটা খটকা হলো মনে। ২৪÷৭-এর মান দেখি ৩.৪২৮৫৭১ ৪২৮৫৭১ ৪২৮৫৭১... কী যেন একটা হচ্ছে, কী যেন একটা হচ্ছে—আবার দেখি ২৫÷৭=৩.৫৭১৪২৮ ৫৭১৪২৮ ৫৭১৪২৮ ৫৭১৪২৮...।

আসলে সবাই ঘুরে ফিরে '১৪২৮৫৭ এই সংখ্যাগুলোর মাঝেই রয়ে গেছে। পৃথিবীর যেকোনো পূর্ণসংখ্যাকে ৭ দিয়ে ভাগ দিলে দশমিকের পর হয় শূন্য থাকবে (যদি নিঃশেষে বিভাজ্য হয়), আর নয়তো '১৪২৮৫৭'-এর মাঝেই আটকা পড়তে হবে। এখানে একটা চক্র আছে! দশমিকের পর একঘর দেখলেই বাকি অনন্তঘর বলে দেওয়া যায়। যেমন ৪৮÷৭=৬.৮... দশমিকের পর পেলাম ৮। তাহলে বাকিটুকু আর ভাগ করার দরকার নেই— চক্র দেখেই বলে দিতে পারি, এটা হবে ৬.৮৫৭১৪২ ৮৫৭১৪২ ৮৫৭১৪২... তাহলে ১৯÷৭ কত হবে?

যাহোক, আমি যখন ঠিক তোমাদের বয়সী, তখন এই চক্রটা বের করেছিলাম। একটা হাস্যকর নাম দিয়েছিলাম, ভাগীয় চক্র, যদিও অভিধানে ভাগীয় বলে কোনো শব্দ নেই। পরে জেনেছি, এটাকে বলে পৌনঃপুনিক চক্র। নম্বর থিওরি বা সংখ্যাতত্ত্বে এটা নিয়ে বড় বড় গবেষণা আছে। আমি একা একা চিন্তা করে ওইটুকু বের করে ফেলেছি, সেটার মধ্যেও একটা আবিষ্কার আবিষ্কার ব্যাপার আছে, তাই না?

এমন চক্র কি শুধু ৭-এর জন্যই আছে?

নাহ, যদি ভাগফলের দশমিকটা একটু পরেই শেষ হয়— যেমন ২.৩২, তখন তাদের আমরা বলি সসীম দশমিক। কোনো সংখ্যাকে যদি ২ দিয়ে ভাগ দাও সসীম দশমিক পাবে। ৪ দিয়ে ভাগ দিলে সসীম পাবে, ৫ দিয়ে ভাগ দিলে সসীম পাবে, ৮ দিয়ে, ১০ দিয়ে, ১৬ দিয়ে, ২০ দিয়ে, ২৫ দিয়ে ভাগ দিলে সসীম পাবে। এরা আসলে কারা? যাদের ভেতর মৌলিক সংখ্যা আছে শুধু ২ আর ৫ আছে! ১০ এর ভেতরে তাকাও, সেখানে আছে ২ আর ৫। ২৫ এর ভেতরে আছে শুধু দুইটা ৫। এমন করে ৫০ এ আছে দুইটা ৫ আর একটা ২। দিয়ে ভাগ দিলেও সেটা সসীম ভাগফল দেবে। এরা কেন সসীম দেবে সেটা আমি বলব না, তবে তোমাদের ভাবার জন্য একটা ছোট্ট লাইন বলতে পারি—

$$\frac{১}{১৬} = \frac{১}{২ \times ২ \times ২ \times ২} = \frac{১ \times ৫ \times ৫ \times ৫ \times ৫}{২ \times ২ \times ২ \times ২ \times ৫ \times ৫ \times ৫ \times ৫} = \frac{৬২৫}{১০০০০}$$

পৃথ্বী বলল, ও বুঝেছি, আসলে নিচে ১০ বা ১০-এর পাওয়ার বানানোটাই আসল। ২ কিংবা ৫ থাকলে সেটা সব সময় সম্ভব। অন্য সময় সম্ভব না।

বান্টি মনে করিয়ে দিল, ভাইয়া, আমি তো জানতে চাইলাম কখন পৌনঃপুনিক আসবে?

আমি তো সেটাই বললাম, পৃথ্বীও সেটাই বলল। যেসব ভাজক থেকে সসীম দশমিক আসবে না, তারা ছাড়া আর সবাই পৌনঃপুনিক মান দেবে। নিঃশেষে বিভাজ্য হলে অবশ্য দশমিকের পর কিছুই থাকবে না। মানে হলো— এসব ক্ষেত্রে দশমিকের পর হয় কিছুই থাকবে না, নয় অনন্তকাল চলবে। যেমন ৬ থেকে ৩ দিয়ে ভাগ দিলে পাবে ২, দশমিকের পর কিছু নাই। ৭-কে ৩ দিয়ে ভাগ দিলে পাবে ২.৩৩৩৩৩৩... এমন অনন্তকাল ৩ আসবে। ৩ এর চক্র দুইটা। হয় ৩৩৩ আসবে, নয় ৬৬৬৬৬।

যেমন ১৭-এর চক্র একটা সেখানে আছে ১৬টা অঙ্ক। ১৭ দিয়ে ভাগের জন্য চক্রটা হলো— ০৫৫৮৮২৩৫২৯৪১১৭৬৪৭ ০৫৫৮৮২৩৫২৯৪১১৭৬৪৭ ০৫৫৮৮২৩৫২৯৪১১৭৬৪৭ এগুলোই বারবার ঘুরে ঘুরে আসে। ১৩-এর জন্য আবার দুইটা চক্র লাগে।

বলে তূর্য ওদের দিকে তাকায়, ও বোঝে ওদের মনে প্রশ্ন— এমন কেন হয়। তূর্য ভাবে— এমন সব প্রশ্ন যাদের মাথায় উঁকি দিচ্ছে, গণিতের ভালোবাসার বীজ বোনা হয়ে গেছে তাদের মাথায়! এই যে কৌতূহল, আরেকটু দেখার ইচ্ছে, এটা থেকেই তো সব জ্ঞানের শুরু।

পাইয়ের মান অতঘর জেনে লাভ কী?

আলোচনা যে পাই নিয়ে ছিল সেটা অনেকেই ভুলে গিয়েছিল। তন্বী মনে করি দিল, ভাইয়া π নিয়ে আরও একটা প্রশ্ন আছে আমার π=৩.১৪১৫৯২৬৫৩৫৮৯৭৯৩২৩৮৪৬২৬৪৩৩... এভাবে তো আজীবন চলতেই থাকবে। কিন্তু এত ঘর কি আসলে কাজে লাগে কখনো?

তূর্য বলল, সত্যি কথা বলতে এত ঘর ব্যবহারের তেমন কোনো ব্যবহারিক প্রয়োগ নেই! যদি মাপামাপির কথা ভাবি, বলা হয়, পরমাণুর গভীরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাবের জন্য দশমিকের পর ৩৯ ঘর নিলেই চলে! মহাকাশের হিসাব-নিকাশও যত সূক্ষ্ম হয় তত ভালো। তবে গণিতে ব্যবহার হওয়াটাই মূল কথা না! সৌন্দর্যও জরুরি!

আরেকটা ব্যবহার বলতে পারি! দশমিকের পরে পাই-এর যে মান সেটা একটা র‍্যান্ডম নম্বর, খন কোনটা হবে তা কোনো নিয়ম মানে না, আগের এক শটা দেখলেও ধারণা করা যায় না পরের একটা অঙ্ক কত হবে! এমন সংখ্যা পাওয়া খুব সহজ কথা না! পরিসংখ্যানে এমন র‍্যান্ডম নম্বর দিয়ে অনেক হিসাব করা হয়! তখন পাই-এর মান হাতের কাছে থাকলে সহজেই র‍্যান্ডম সংখ্যা পাওয়া যাবে!

[illegible] একটা জিনিস ঠিকঠাক বুঝি না। বৃত্তে পাইয়ের মান ১৮০ ধরা হয় কেন? পাইয়ের মান তো ৩.১৪১৫৯২৬...।

কোণের ক্ষেত্রে পাইয়ের মান ১৮০ ডিগ্রি কীভাবে?

তূর্য বলল, ১৮০ ডিগ্রি হলো পাই রেডিয়ান। এখানে সম্পর্কটা ডিগ্রি আর রেডিয়ান, এই দুইটা এককের। যেমন ১ ফুট = ১২ ইঞ্চি, তাহলে কি ১ আর ১২ সমান। তা তো নয়।

আর পাই রেডিয়ানের ব্যাপারটা এসেছে রেডিয়ান কোণের সংজ্ঞা থেকে। রেডিয়ান যদি বুঝতে চাই তাহলে আসলে অবশ্যই বৃত্ত লাগবে। কারণ রেডিয়ানের পরিমাপটাই হচ্ছে বৃত্তীয় পরিমাপ।

মনে করো এটা একটা বৃত্ত যার বৃত্তের ব্যাসার্ধ= r। ধরো, আমার খুব ইচ্ছে হলো যে আমি এই বৃত্তের পরিধি বরাবর বাঁকা পথ ধরে বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান দূরত্ব অতিক্রম করব। তখন কেন্দ্রে যে কোণটা উৎপন্ন হবে, সেই কোণটাকে বলে ১ রেডিয়ান। এটাকে ছোট হাতের c দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

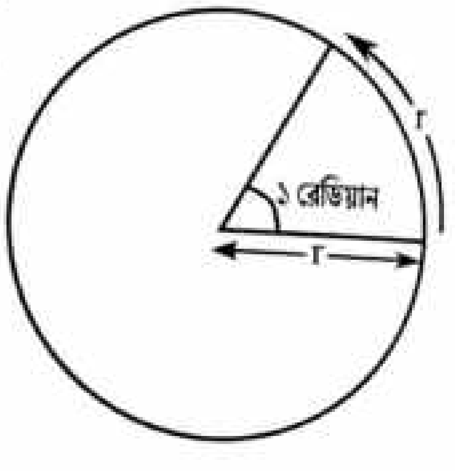

এখনকার হিসাবটা আমাদের আরও সোজা।

চাপ যখন r তখন কোণ হবে ১ রেডিয়ান

চাপ যখন ১ তখন কোণ হবে ১/r রেডিয়ান

চাপ যখন $2\pi r$ তখন কোণ হবে $2\pi r/r = 2\pi$ রেডিয়ান।

$2\pi r$ তো বৃত্তের পরিধি। তাহলে চাপ $2\pi r$ হওয়ার মানে পুরো বৃত্তটাই ঘোরা হয়ে গেছে। ডিগ্রিতে বললে এটাই ৩৬০ ডিগ্রি। ৩৬০ ডিগ্রি মানে 2π রেডিয়ান। পরিধির অর্ধেক নিয়ে ভাবলে পাবে, ১৮০ ডিগ্রি মানে π রেডিয়ান।

রেডিয়ান কোণ কী?

ভাইয়া, আপনি বললেন বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান চাপ বৃত্তের কেন্দ্রে যে কোণ তৈরি করে সেটাই এক radian বলে। ক্যালকুলেটরে এক radian-কে degree-তে নিলে পাই ৫৭.২৯৫৭৭৯৫১, কিন্তু কম্পাস দিয়ে আঁকার পর মাপলে হয় ৬০ ডিগ্রি, এর কারণ কী? এখানে আসলে কী হচ্ছে?

এক রেডিয়ান কোণ কি আদৌ পেনসিল-কম্পাসে আঁকা যায়?

তূর্য বলল, আমাদের আঁকানোতে ভুল শেখানো হয়, আসলে এক রেডিয়ান কোণ রুলার এবং কম্পাস দিয়ে আঁকা যায় না।

রেডিয়ান কোণের বেলায় যখন আমরা বলি, বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান চাপ, তখন বোঝায় ওই চাপটা মানে বাঁকা পথটার দৈর্ঘ্য r-এর সমান।

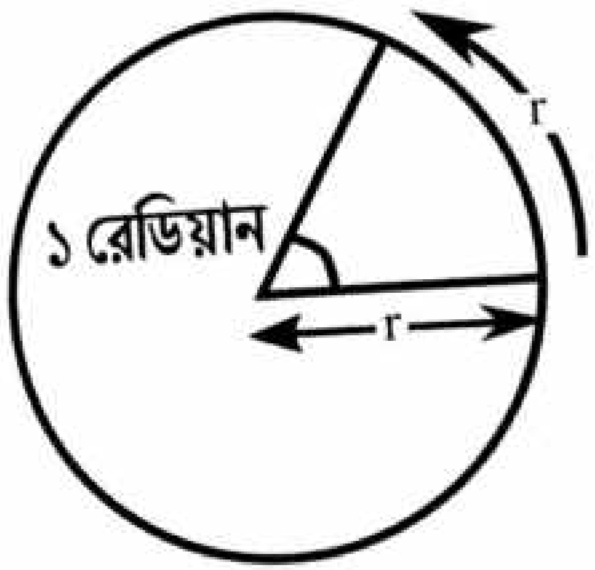

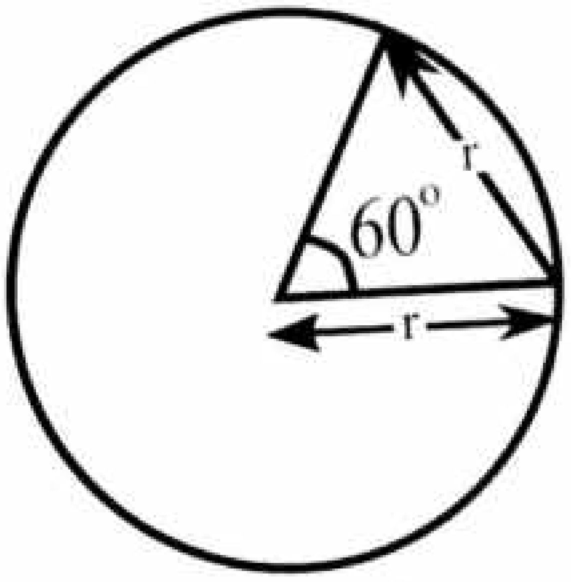

কিন্তু আমরা যখন কম্পাস দিয়ে r-এর সমান করে কেটে নিই, আমরা বাঁকা পথটা মাপতে পারি না। মাপি চাপের দুই মাথার দূরত্ব। সেটা কিন্তু চাপের দৈর্ঘ্য না; বরং ওই দুই প্রান্ত যোগ করলে যে জ্যা পাওয়া যাবে তার দৈর্ঘ্য। আবার বলছি, কম্পাস দিয়ে এখানে আমরা একটা জ্যা-এর দৈর্ঘ্য মাপি, চাপের না। জ্যা-এর মাথা দুইটা যোগ করে দিলে ভালো করে বোঝা যাবে কী হচ্ছে ব্যাপারটা। বলে পাশাপাশি দুইটা বৃত্ত এঁকে একটাতে এক রেডিয়ান আর অন্যটায় ৬০ ডিগ্রি এঁকে বোঝাল ভাইয়া। জ্যা-এর দৈর্ঘ্য যদি ব্যাসার্ধের সমান হয়, তখন আমরা আসলে পাই একটা সমবাহু ত্রিভুজ। ওই জ্যা-এর দুই মাথা থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত এমনিতেই ব্যাসার্ধ। আবার জ্যাটাও ব্যাসার্ধের সমান। তিনটে বাহুই সমান। পেলাম সমবাহু ত্রিভুজ, যার প্রতিটা কোণ ৬০ ডিগ্রি। ফলে আমরা আসলে আঁকি ৬০ ডিগ্রি, যেটা মোটেও রেডিয়ান কোণ নয়।

তাহলে রেডিয়ান কীভাবে আঁকব তাহলে?

রুলার, কম্পাস দিয়ে সম্ভব নয়। চাঁদা দিয়ে ৫৭ ডিগ্রির কাছাকাছি আঁকা যেতে পারে।

এবারে আরেক ধরনের কোণের কথা মাথায় এল তন্বীর, ভাইয়া, আমার সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটারে লেখা আছে D,R,G। এখানে D মানে Degree, R মানে Radian, কিন্তু G তে কী হয়?

ও আচ্ছা, G মানে gradian।

গ্রেডিয়ান জিনিসটা আসলে কী?

গ্রেডিয়ান আসলে কী?

এটা আসলে খুব সহজ জিনিস, আমরা জানি এক সমকোণ হলো ৯০ ডিগ্রি। যদি এই ১ সমকোণকে ১০০টা সমান ভাগে আমরা ভাগ করে ফেলি, তখন এই প্রতিটা ভাগকে বলে এক একটা গ্রেডিয়ান। অর্থাৎ ১ সমকোণ = ১০০ গ্রেডিয়ান।

মেট্রিক পদ্ধতি যখন আবিষ্কার হলো, তখন মানুষ দশ দশ নিয়ে চিন্তা করত, দশ, এক শ, এক হাজার। তখন তারা এক সমকোণকে এক শ ভাগে ভাগ করার চিন্তা করেছিল। এটাকে বলা হতো ১ গ্রেডিয়ান বা এটাকে এখন 1 gon-ও বলে। প্রকৌশলে সার্ভে বলে একটা ব্যাপার আছে। সেই কাজ করার সময় কিছু ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার হয়। তা ছাড়া এটা খুব ব্যবহৃত হয় না।

কোণ আর বৃত্তের আলোচনা দেখতে দেখতে বান্টির মনে পড়ল, প্রথম দিন ভাইয়া বলেছিলেন, গোলকের আয়তনের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবেন। স্মরণ করিয়ে দিতে অঙ্ক ভাইয়া বললেন,

গোলকের আয়তন ও পেঁয়াজকুচি পদ্ধতি

এটা অনেকভাবে চিন্তা করা যায়। তোমাদের বলি পেঁয়াজ-কুচি পদ্ধতিতে কী করে গোলকের আয়তন বের করে সেটার কথা। আমার চাচাতো ভাইয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে বাবুর্চি বড় বড় পেঁয়াজ কাটছিল। ওটা দেখে এই ধারণাটা আমার মাথায় আসে। তোমাদের বোঝাই। মনে করো পেঁয়াজটা সুষম গোলকাকৃতির। শুরুতেই পেঁয়াজটাকে অর্ধেক করে নিলাম। অর্ধেক আয়তন যদি বের করতে পারি, পুরোটা হবে তার দ্বিগুণ। এবার ছবি এঁকে বোঝাই। বলে ভাইয়া একটা ছবি আঁকল।

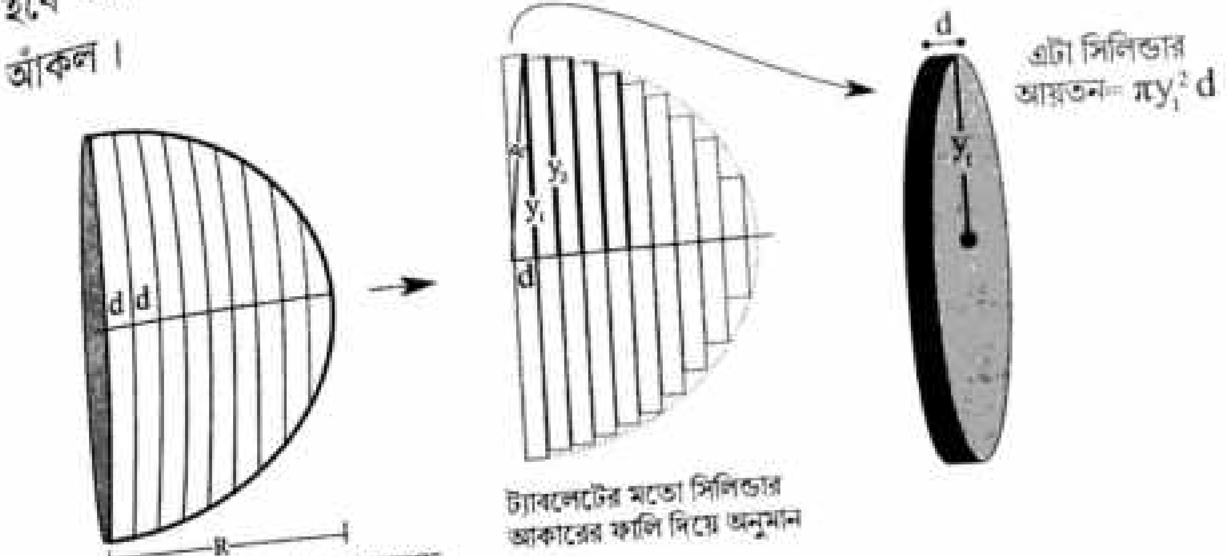

ব্যাসার্ধ R কে n ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যার প্রতিটা ভাগ d; তাহলে, R=nd

ট্যাবলেটের মতো সিলিন্ডার আকারের ফালি দিয়ে অনুমান

মনে করো, গোলকের ব্যাসার্ধ R। এবার এই অর্ধেক পেঁয়াজটাকে আমরা ছবির মতো করে ফালি ফালি করব। ধরো, R ব্যাসার্ধের অর্ধপেঁয়াজটাকে আমরা nটা সমান পুরুত্বের ফালি করলাম। প্রতিটা ফালির পুরুত্ব d। তাহলে বলা যায়, nd=R। সবাই মাথা ঝাঁকায়, এটুকু বোঝা যাচ্ছে।

এবার দেখো আমাদের কাছে nটা পেঁয়াজ ফালি আছে। একেকটা ফালি দেখতে প্রায় সিলিন্ডারের মতো।

নাকি ভাইয়া, অ্যান্টাসিড ট্যাবলেটের মতো?

হায়রে কল্পনা রে! আচ্ছা যাও, তা-ই ধরলাম। দেখো, প্রতিটার ব্যাসার্ধ কিন্তু একই না। প্রথমটা একটু বেশি, এরপর আস্তে আস্তে কমছে। ধরো এই ব্যাসার্ধগুলো হচ্ছে y_1, y_2, y_3 এমন করে করে y_n। প্রথম ফালির দিকে দেখো। বলে ভাইয়া অর্ধগোলকটার পাশে প্রথম ফালিটাকে আলাদা করে আঁকলেন।

এটার ব্যাসার্ধ y_1, আর পুরুত্ব d, তাহলে আয়তন কত হবে?

তন্বী ঝটপট উত্তর দিল, এটাকে যদি সিলিন্ডার ভাবা যায়, আয়তন হবে $\pi y_1^2 d$।

চমৎকার! তাহলে পুরো অর্ধগোলকের আয়তন হবে এমন সবগুলো ফালির যোগফল—

অর্ধগোলকের আনুমানিক আয়তন

$$= \pi y_1^2 d + \pi y_2^2 d + \pi y_3^2 d + \dots + \pi y_n^2 d$$
$$= \pi d\,(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + \dots y_n^2)$$

কিন্তু এই যে বললাম y_1, এটার কিন্তু আরেকটা পরিচয় আছে, যেটা পিথাগোরাসের উপপাদ্য থেকে বের করা যায়। অর্ধপেঁয়াজের ছবিতে বাম পাশে খেয়াল করো, বাঁকা করে একটা দাগ দিয়েছি, মাঝে লিখেছি R। কেন্দ্র থেকে গোলকের গায়ের যেকোনো বিন্দুর দূরত্বই তো R, তাই না? তাহলে পিথাগোরাস থেকে পাব—

$R^2 = y_1^2 + d^2 \Rightarrow y_1^2 = R^2 - d^2$ ।

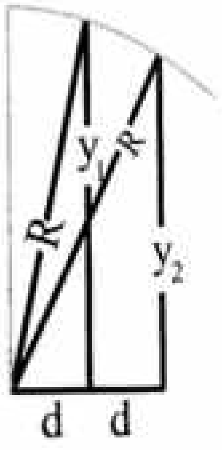

এবার y_2-এর কথা ভাবো। এবার নিচে থাকবে 2d। এটাকেও একইভাবে লেখা যায় $y_2^2 = R^2 - (2d)^2$। একইভাবে আমরা পাব, $y_3^2 = R^2 - (3d)^2$, এমন করে $y_n^2 = R^2 - (\mathrm{n}d)^2$, সবগুলো বসিয়ে দিলে আমরা পাব,

অর্ধগোলকের আনুমানিক আয়তন

$$= \pi d(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + \dots + y_n^2)$$
$$= \pi d\{R^2 - d^2 + R^2 - (2d)^2 + \dots + R^2 - (\mathrm{n}d)^2\}$$
$$= \pi d\{\mathrm{n}R^2 - d^2(1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + \mathrm{n}^2)\}$$
$$= \pi d\{\mathrm{n}R^2 - \tfrac{d^2 n(n+1)(2n+1)}{6}\}$$

এখানে ধারার একটা সূত্র ব্যবহার করেছি, প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের যোগফলের সূত্র। এটার প্রমাণ আপাতত বোঝাচ্ছি না। তবে বলে রাখি এটাকে বীজগণিত ছাড়াই দেখে দেখে *Feel* করা যায়। আবার দেখি—

অর্ধগোলকের আনুমানিক আয়তন

$$= \pi d\,\{nR^2 - \frac{d^2 n(n+1)(2n+1)}{6}\} = \pi n d R^2 - \frac{\pi d^3 n(n+1)(2n+1)}{6}$$

এবারে মনে রেখো nd=R, বা $\mathrm{d} = \frac{R}{n}$। d-এর এই মান বসালে পাবে

অর্ধগোলকের আনুমানিক আয়তন

$$= \pi n d R^2 - \frac{\pi d^3 n(n+1)(2n+1)}{6} = \pi R^3 - \frac{\pi R^3}{n^3}\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

আমরা খুব কাছাকাছি! পরের রাশির n^3 কে n(n + 1)(2n + 1) এদের প্রত্যেকের তলায় আলাদা করে নিয়ে যাই। কেন যাচ্ছি, সেটা বলব।

অর্ধগোলকের আনুমানিক আয়তন

$$= \pi R^3 - \frac{\pi R^3}{6}\left(\frac{n}{n}\right)\left(\frac{n+1}{n}\right)\left(\frac{2n+1}{n}\right) = \pi R^3 - \frac{\pi R^3}{6}\left(1 + \frac{1}{n}\right)\left(2 + \frac{1}{n}\right)$$

n/n কেটে দিয়েছি। খেয়াল করো, আমরা এখানে যে আয়তন পেলাম, সেটা আসলে আনুমানিক। কারণ পেঁয়াজ ফালিগুলো ঠিক ঠিক সিলিন্ডার ছিল না, তাদের ধারগুলো গোলকের মতো বাঁকানো। কিন্তু যদি আমরা পেঁয়াজটাকে আরও অনেক অনেক ভাগে ভাগ করতাম, তাহলে তাদের পুরুত্ব কমত, তারা আরও নিখুঁত আয়তন দিত। একেবারে ঠিক আয়তন পেতাম যখন ভাগসংখ্যা হতো অসীম বা $n \to \infty$, সে ক্ষেত্রে $\frac{1}{n}$, $\frac{2}{n}$ এরা হয়ে যেত শূন্য। এই মানগুলোকে বসালে পাব সঠিক আয়তন।

অর্ধগোলকের সঠিক আয়তন

$$= \pi R^3 - \frac{\pi R^3}{6}(1+0)(2+0) = \pi R^3 - \frac{\pi R^3}{6} \times 2 = \pi R^3 - \frac{\pi R^3}{3} = \frac{2\pi R^3}{3}$$

অতএব পুরো গোলকের আয়তন $= 2 \times \frac{2\pi R^3}{3} = \frac{4}{3}\pi R^3$

সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। মনে হলো একটা বিরাট বোঝা নামল।

ভাইয়া বললেন, অন্য কাউকে অঙ্ক করতে দেখলে অনেক সময় মনে হয় কী কঠিন ব্যাপার। আমি যে লাইনগুলো লিখলাম, তুমি যদি নিজে একবার এই লাইনগুলো লেখো, বিশ্বাস করো পুরোটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে। এরপর ভাইয়া বললেন ঠিক একইভাবে বর্গাকার ভূমিবিশিষ্ট একটা পিরামিডের আয়তনও বের করা যায়, যার মান হয় $\frac{1}{3}$ × উচ্চতা × ভূমির ক্ষেত্রফল। এবং এই দুটো তথ্য ব্যবহার করে দেখানো যায়

গোলকের ক্ষেত্রফল কীভাবে $4\pi R^2$ হয়।[৪]

তূর্য জানায়, এই যে নিয়মটা তোমাদের দেখালাম— এটাকে আমি বলি শিশু ক্যালকুলাস। তোমরা পরের ক্লাসে উঠে ক্যালকুলাস শিখবে। এটা আধুনিক গণিতের অসাধারণ এক হাতিয়ার। এখানে আমি ক্যালকুলাসের ধারণাই ব্যবহার করেছি, তবে কোনো সূত্র ব্যবহার করিনি। এ জন্যেই এটাকে বলি শিশু ক্যালকুলাস।

বহুদিন ওদের কোনো নতুন সমস্যা দেননি অঙ্ক ভাইয়া। আজ দিলেন। তোমরা কি শিশু ক্যালকুলাস পদ্ধতিতে কোণকের আয়তনের সূত্রটা বের করতে পারবে? মাথাভর্তি চিন্তা নিয়ে ওরা বাসায় ফিরল।

তূর্য ভাবে, এই চিন্তা করাটাই জরুরি, উত্তর পাওয়ার থেকেও বেশি। গন্তব্য নয়, পথটাই আসল!

---

[৪] বর্তমান লেখকের *গণিতের রঙ্গে: হাসিখুশি গণিত* (৩য় সংস্করণ) বইটির *গোলকবাবু ও ঘ্যাচাং মাস্টার* অধ্যায়ে আরও সহজ করে এই প্রমাণগুলো দেয়া হয়েছে।

অধ্যায় ৭

সুরের মায়ায় বাঁধা যখন গণিত

৭.১

আজও বাসায় ফিরতে দেরি হলো তূর্যের— বন্ধুদের সাথে একটা গানের আড্ডায় ডুবে গিয়েছিল। তূর্যের বন্ধু তন্ময় দারুণ গান করে, গিটার বাজিয়ে। কলেজের মাঠের এক কোনায় বসে ও গান করছিল। সাথে গলা মেলাচ্ছিল বাকিরা। তূর্যের নিজেরও গান নিয়ে অনেক আগ্রহ। গিটার কিনেছিল শখ করে, দুটো একটা কর্ড শেখার পর ও টের পেয়েছে গিটারের সংগীতের থেকে ওর বেশি আগ্রহ গিটারের গণিতের প্রতি। গণিতটা কিছুটা বোঝা হয়েছে, এখন গিটারে জমছে ধুলো।

গানে-আড্ডায় তূর্য ভুলেই গিয়েছিল তন্বী-বান্টিরা যে পড়তে আসবে— সেটার কথা। আড্ডা থেকে ফিরে সাইকেলটা রেখে বাসায় ঢুকবে, এমন সময় একটা মিহি গলার আওয়াজ শুনতে পেল ও। কেউ খুব সুন্দর করে নজরুলসংগীত গাইছে, 'যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পারো নাই, কেন মনে রাখো তারে...'। ও দরজায় বাইরে অপেক্ষা করে কিছুক্ষণ। গানটা শেষ হতেই ভেতরে ঢোকে। দেখে টিনা, বান্টি আর ওর মা তালি দিচ্ছেন। আর পৃথ্বী মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তন্বীর দিকে। তন্বীই যে গাইছিল বুঝতে পারে তূর্য।

বাহ, তুমি তো খুব সুন্দর গান করো।

টিনা বলে, জি ভাইয়া, তন্বী আমাদের ক্লাসের ফিরোজা বেগম।

কী দারুণ! আজকে আমার দিনটা বেশ সংগীতময় যাচ্ছে। থামলে কেন

তন্বী, আরও শুনি।

তন্বী লজ্জা পেয়ে যায়, ভাইয়া, আরেক দিন!

আচ্ছা, তোমরা কী জানো এই গান ব্যাপারটাও কী দারুণ গণিতময়?

পৃথ্বী অবাক গলায় বলে, বলেন কী, সত্যিই?

হ্যাঁ। ছেলেবেলায় ভাবতাম যারা গান ভালোবাসে, তারা অন্য জগতের মানুষ, তাদের চিন্তায় সুর-শব্দ-কথার ঝংকার। আর যারা বিজ্ঞানী মানুষ, তাদের জগৎটা একেবারেই আলাদা— নানান রকম যন্ত্রপাতি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর সেই সাথে গণিতময় নানান তত্ত্ব। তখন ভাবতেও পারিনি গণিতের সাথে কী দারুণ সখ্য সংগীতের। আজ আমরা জানি সংগীতের যত বাদ্যযন্ত্র, যত ব্যাকরণ— তাদের মাঝে কত নিবিড়ভাবেই না জড়িয়ে আছে গণিত!

গানের সাথে গণিতের সম্পর্ক কবে থেকে জানে মানুষ?

মানুষ গান আর গণিতের ভেতর সম্পর্ক কীভাবে বের করল?

সেই গল্পটাও মজার। তাকে তোমরা চেনো। এখন থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের কথা। এই সময়টাতে প্রাচীন গ্রিসের সামোস দ্বীপে জন্ম নিয়েছিলেন এক মহা মনীষী, যার চিন্তাভাবনা ছিল খুবই অদ্ভুত রকমের। তিনি বলতেন, এই পৃথিবীর সবকিছুকে নাকি সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যায়, এমনকি মানুষের আত্মাকেও। তিনি হলেন মহান পিথাগোরাস, যার উপপাদ্যের কথা সেদিন তোমাদের বলছিলাম। তো পিথাগোরাস শুধু বলেই ক্ষান্ত হলেন না, এমন অনেক কিছুকে তিনি সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করে দেখালেন যে, সবাই তাজ্জব বনে গেল।

একবার নাকি তিনি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পেলেন একটা কামারের দোকানে চারজন কামার চারটা হাতুড়ি দিয়ে লোহা পেটাচ্ছে। হাতুড়ির আওয়াজ একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর শোনা যাচ্ছে— মনে হচ্ছে যেন কেউ বাদ্য বাজাচ্ছে। এটা শুনেই তার মাথায় চিন্তা এল, আচ্ছা সংগীতকে কি কোনোভাবে সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যায়? গুরু ভাবনায় পড়ে গেলেন। এরপর নিয়মিত সেই কামারের দোকানে গিয়ে গভীর মনোযোগে পর্যবেক্ষণ করা শুরু করলেন। তিনি খেয়াল করলেন চারজনের হাতুড়ির আকার আলাদা আলাদা এবং চারজনের উৎপন্ন শব্দও আলাদা রকমের। তিনি দেখলেন দুইটা হাতুড়ি যখন একসাথে পড়ে কখনো কখনো শুনতে ভালো লাগে আবার কখনো খুবই শ্রুতিকটু লাগে। তিনি দেখলেন সবচেয়ে বড় আর মাঝারি বড় একসাথে বাজলে শুনতে ভালো লাগে না, মাঝারি বড় আর মাঝারি ছোট—এগুলো একসাথে বাজলেও শুনতে ভালো লাগে না। কিন্তু সবচেয়ে বড় আর মাঝারি ছোট এই দুটো একসাথে শব্দ করলে শুনতে ভালো লাগে! আবার সবচেয়ে ছোট আর সবচেয়ে বড়টা যখন একসাথে বাজে, মনে হয় যেন দুজন একেবারে ঠিক সুরে গলা মিলিয়ে গান গাইছে। এরপর অঙ্ক কষে পিথাগোরাস বের করে ফেললেন আকারের সাথে সুরের সম্পর্ক আর তারপর সুরের সাথে সুর মেলানোর গণিত! তার প্রায় দুই শ বছর পর গ্রিসেরই আরেক দার্শনিক অ্যারিস্টোজেনাস সংগীতের ওপর একটা বিশাল বই লিখে ফেলেন; যার নাম ছিল Elementa Harmonica। এই বইটিতেই তিনি দেখিয়ে দিলেন সংগীতের পুরো ব্যাপারটাই আসলে গণিতে মোড়া!

বিজ্ঞান কী বলে, গান আসলে কী?

আচ্ছা ভাইয়া, গাণিতিকভাবে চিন্তা করলে গান ব্যাপারটা আসলে কী?

এভাবে শুনতে হয়তো খুব কাঠখোট্টা লাগবে, তবুও বলি, সংগীত আসলে এক প্রকার শক্তির প্রকাশ, যাকে আমরা বলি শব্দশক্তি! একটা একতারার তার যখন আমরা টুং করে নাড়া দিই, তারটা নিজে কাঁপার সময় কাঁপিয়ে যায় তারের চারপাশের বাতাস। সেই বাতাস নাড়িয়ে দেয় আমাদের কানের পর্দাটা আর পর্দার কাঁপুনিটা রাসায়নিক আর বিদ্যুৎ শক্তি হয়ে পৌঁছে যায় আমাদের মস্তিষ্কে। আর তখন আমাদের মনে হয় কিছু একটা শুনতে পেলাম। ওই শব্দটা আমাদের কানে আসার পথে বাতাসকে প্রতি সেকেন্ডে কতবার সামনে-পেছনে করে কাঁপিয়েছে, সেটাকে বলে শব্দটার কম্পাঙ্ক। এই কম্পাঙ্কটাই হলো মূল ব্যাপার। এটাই নির্ধারণ করে দেয় শব্দটা শুনতে কেমন হবে। কম্পাঙ্ক যত বেশি হবে, তত শব্দটা শুনতে চিকন মনে হবে। সাধারণত মেয়েদের গলার কম্পাঙ্ক ছেলেদের চেয়ে বেশি। ছেলেরা সাধারণভাবে কথা বলার সময় বাতাসকে কাঁপায় সেকেন্ডে ৮৫ থেকে ১৮০ বার। আর মেয়েরা কাঁপায়

১৬৫ থেকে ২৫৫ বার। কথা বলার সময় কিংবা বাদ্যযন্ত্র বাজানোর সময় আমরা নানান কম্পাঙ্কের শব্দ করি আর সেগুলোই আমাদের কান দিয়ে মস্তিষ্কে গিয়ে নানা রকম অনুভূতির সৃষ্টি করে। সভ্যতার একটা পর্যায়ে গিয়ে মানুষ বুঝতে শিখল কিছু শব্দ একটার পর একটা শুনলে কিংবা একসাথে একটা ভালো লাগার অনুভূতি তৈরি হয়। শব্দশক্তি থেকে তখন জন্ম হলো সংগীতের।

সা-রে-গা-মা-র গণিত

তন্বী বলল, ভাইয়া, সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা দিয়েই তো সব গান। এগুলোকে মৌলিক সংখ্যার মতো ভাবা যায়?

ভাবতে পারো, সংগীতের মূল কাজ এদের নিয়েই। এদের বলে একেকটা স্বর বা note। আরও ভালো করে বললে এরা হলো শুদ্ধ স্বর। এটুকু বলে ভেতরে ঢুকল, বের হয়ে এল একটা হারমোনিয়াম নিয়ে।

এটা মায়ের হারমোনিয়াম।

বলেন কী, আন্টিও গান করেন!

করতেন একসময়, বহুদিন, আমরা আর কেউ শুনিনি। একটু বিষণ্ন শোনায় তূর্যের গলার স্বর। এরপর ও বলে, হারমোনিয়ামের দিকে ভালো করে তাকালে দেখবে নিচে সারি সারি সাদা বোতাম, আর ওপরে একবার দুইটা কালো বোতাম, তারপর একটু ফাঁকা রেখে তিনটে কালো বোতাম। দুইটা কালো বোতাম যেখানে সেটার বাম পাশেরটার ঠিক নিচের সাদা বোতামটাকে ইংরেজিতে বলে C note। এখান থেকেই সাধারণত 'সা' বাজানো হয়; যদিও আসলে সা রে গা মা সব জায়গা থেকেই শুরু করে বাজানো যায়। এখান থেকে শুরু করে পরপর সাদা বোতামগুলো বাজিয়ে গেলেই সা রে গা মা পরপর বাজতে থাকবে। এখান থেকে ভাবলে ইংরেজিতে সা রে গা মা পা ধা নি হলো C, D, E, F, G, A, B। ওপরের যে কালো বোতামগুলো এরাও কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এরা হলো কোমল রে (ঋ), কোমল গা (জ্ঞ), কড়ি মা (হ্ম), কোমল ধা (দ) এবং কোমল নি (ণ)। ঠিক বলেছি না, তন্বী?

তন্বী সায় জানাল, জি ভাইয়া!

ইংরেজিতে এদের Sharp বলে (যেমন C# মানে হলো C Sharp)। এদের যদিও বিকৃত স্বর বলে, এরাও মূল স্বরের সমান গুরুত্বপূর্ণ। ৭টি শুদ্ধ আর ৫টি বিকৃত এই মোট ১২টি স্বর হলো সব সংগীতের মূলে। এরপর আবার সা রে গা মা শুরু হয়ে চলতে থাকবে (ছবিটাতে একটু দেখে নিতে পারো হারমোনিয়ামে কোন বোতামটাকে কী বলে)।

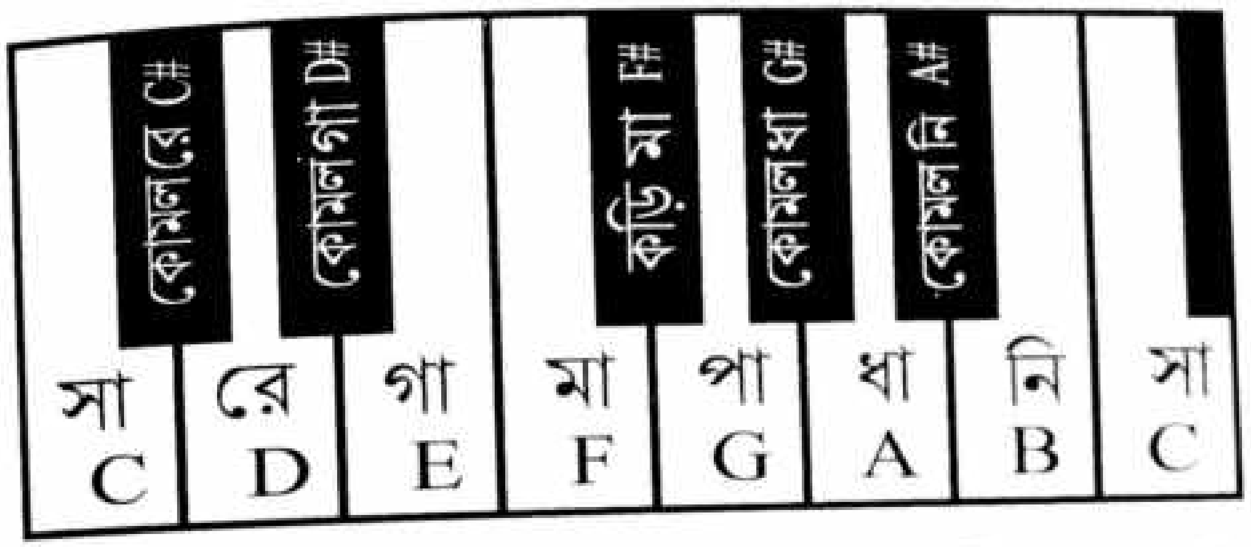

এবার একটু গণিত— তুমি যখন হারমোনিয়ামের মধ্যিখানে সা (C) বাজাও, এর কম্পাঙ্ক হলো ২৬২ হার্জ, মানে তখন বাতাস সেকেন্ডে ২৬২ বার কাঁপে। অন্য স্বরগুলোর কম্পাঙ্ক এমন—

স্বর	C	C#	D	D#	E	F	F#
কম্পাঙ্ক	২৬২	২৭৭	২৯৪	৩১১	৩৩০	৩৪৯	৩৭০
স্বর	G	G#	A	A#	B	C	
কম্পাঙ্ক	৩৯২	৪১৫	৪৪০	৪৬৬	৪৯৪	৫২৪	

একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবে, আবার যখন C শুরু হয়েছে, তখন সেটা হয়ে গেছে প্রথমটার দুই গুণ (২৬২×২= ৫২৪)। একইভাবে এর পরের C# টা হবে আবার ২৭৭-এর দুই গুণ। দুইটা C শুনতে একই রকম, শুধু একটা একটু মোটা গলা আর একটা চিকন। যেটার কম্পাঙ্ক কম সেটা মোটা শোনায়। সংগীতে সেটাকে বলে নিচু স্বর।

এবার বান্টি জিজ্ঞেস করল, তাহলে, টিভিতে যখন সংগীত প্রতিযোগিতার বিচারকেরা বলে, আরেকটু উঁচু স্কেলে গাও, তার মানে কি আরেকটু বেশি কম্পাঙ্কে গাইতে বলছে?

হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ। দাঁড়াও আরেকটু বোঝাই তোমাদের! বলে সে তার গিটার নিয়ে এল। গিটার ভর্তি ধুলো।

বান্টি টিটকারি দিল, ভাই, এটা কি আসলেই বাজে?

হা হা হা, মনে হয় বাজবে, একটু টিউন করতে হবে। বলে সে তার ফোন বের করে ফোনের সাহায্যে গিটারটাকে টিউন করল।

এটা কী করলেন ভাইয়া?

টিউন করলাম, কোন তারে টোকা দিলে কী কম্পাঙ্কের আওয়াজ বের হবে সেটা নির্দিষ্ট করা আছে। অনেক দিন না বাজানোর ফলে সেটা আর ওই নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কে বাজছে না। এখন তারগুলো টাইট আর ঢিলা করে ঠিক কম্পাঙ্কে নিয়ে এলাম। বলে সে একসাথে সবগুলো তার বাজাল, সুন্দর একটা আওয়াজ হলো।

এটা কী বাজালেন, ভাইয়া?

এ মাইনর কর্ড কী জিনিস?

এ মাইনর কর্ড, আমার খুব প্রিয় একটা কর্ড, বাংলায় অনেক জনপ্রিয় গান এটা থেকে শুরু। এভাবে কয়েকটা স্বর একসাথে বাজালে যখন শুনতে ভালো লাগে তাকে বলে কর্ড। এবারে তোমাদের বলি গাণিতিকভাবে এটা কী বোঝায়।

পিথাগোরাস লক্ষ করেছিলেন যে কিছু কিছু স্বর একসাথে বাজালে শুনতে ভালো লাগে। যেমন একটা C-এর সাথে তার পরের C পরপর বাজালে শুনতে ভালো লাগে। যদি আমরা বিকৃত বা sharp-গুলোকে বাদ দিয়ে শুধু শুদ্ধ স্বরগুলো শুনি তাহলে দেখব একটা C-কে ১ নম্বর ধরলে পরের C-টা হবে ৮ নম্বর। এ জন্য এদের বলে অক্টেভ বা অষ্টক। এদের কম্পাঙ্কের অনুপাত হয় ২ :১।

পিথাগরাসের শিষ্যরা আরও দেখেছিলেন শুদ্ধ স্বর নিয়ে ভাবলে 'চতুর্থ' আর 'পঞ্চম'-এর সাথে ভালো মিল হয়। অর্থাৎ ১ নম্বরের সাথে ৪ নম্বর (যেমন : C-এর সাথে F কিংবা E-এর সাথে A) এবং ১ নম্বরের সাথে ৫ নম্বর (যেমন C-এর সাথে G কিংবা D-এর সাথে A) স্বরগুলো একসাথে বাজলে সেটা শুনতে শ্রুতিমধুর লাগে। পিথাগোরাস ছোট ছোট পূর্ণসংখ্যার সরল অনুপাতের ব্যাপারটা একটু বেশিই ভালোবাসতেন। তাই ১ নম্বরের সাথে ৪ নম্বর যে মিলবে কেননা ৩৪৯/২৬২ প্রায় ৪/৩-এর সমান। আবার ১ নম্বরের সাথে ৫ নম্বরের বেলায়ও এটা ৩/২-এর খুব কাছাকাছি। ৩৯২/২৬২ প্রায় ৩/২-এর সমান। সংগীতে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত দুই ধরনের কর্ড হলো মেজর কর্ড আর মাইনর কর্ড।

চলো তোমাদের গিটারের একটু জ্ঞান দিই। মনে আছে তো, শুদ্ধ, বিকৃত স্বর মিলিয়ে মোট ১২টা নোট বা স্বর আছে?

হ্যাঁ, ভাইয়া।

এবার ওদের সবাইকে নিয়েই ভাবব। যেকোনো একটা স্বরকে আমরা যদি ১ নম্বর বলি, তখন শুদ্ধ, বিকৃত মিলিয়ে ৫ নম্বরে যে আছে আর ৮ নম্বরে যে আছে, এই ১-৫-৮ তিনটা স্বরকে যদি একসাথে বাজাই, আমরা পাব মেজর কর্ড। বলে সে একটা ছবি আঁকল।

এই চক্রাকার ছবিটাতে তাকালে ভালো বোঝা যাবে। যেমন C-কে যদি আমরা ১ নম্বর ভাবি, এরপর C# হবে ২, D হবে ৩, এমন করে আগালে E হবে ৫, আর G হবে ৮। তাহলে ১-৫-৮ হবে C— E -G। এদের যদি একসাথে বাজাই আমরা পাব C মেজর কর্ড। তাহলে বলো তো D sharp মেজর কী হবে?

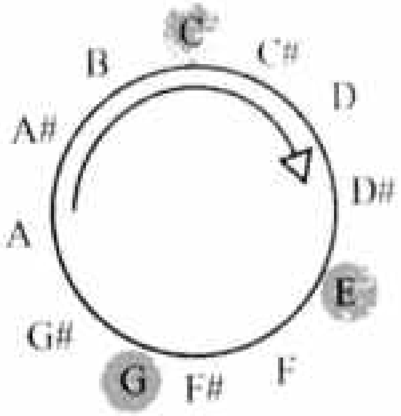

C Major Chord

ওদের একটু সময় লাগল, তবে ওরা ঠিকই খুঁজে বের করল। ওরা দেখল, D#-কে ১ নম্বর ধরলে ৫ আর ৮ নম্বর হবে G আর A#। সবাই ভেবেছিল তন্বী সবার আগে পারবে, কিন্তু উত্তর দিল পৃথ্বী, ভাইয়া, এটা D#-G -A#।

বাহ দারুণ, এই তো তোমরা মেজর কর্ড বুঝে গেছ। এবার শোনো ঠিক একইভাবে ১-৪-৮ বাজালে পাবে মাইনর কর্ড। তাহলে A মাইনর কর্ড কী হবে বলো তো?

বান্টি বলল, A ১ নম্বর হলে ৪ নম্বর হবে C আর ৮ নম্বর হবে E, তাইলে A -C -E হবে এ মাইনর কর্ড। তাই না ভাইয়া?

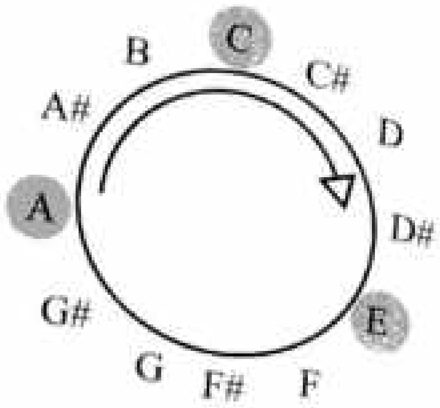

A Minor (Am) Chord

ঠিক তাই। মজার বিষয় হচ্ছে, এরাও কিন্তু পিথাগোরাসের সরল অনুপাতের নিয়ম মানে। A এবং E মানে পঞ্চমের নিয়ম। গিটারে আমরা যখন একেকটা কর্ড ধরি, ঠিক এই চিন্তা থেকেই ধরা হয়। একেবারে যখন কিছুই ধরি না, তাকে বলে ওপেন— ছয়টা তারে তখন EADGBE এগুলো বাজতে থাকে। সবচেয়ে নিচের চিকন তারটাকে বলে ১ নম্বর তার আর ওপরের মোটা তারটা হলো ৬ নম্বর।

গিটারের ওপরের দিকে যেখানে আঙুলগুলো চেপে ধরে বাজায়, সেখানে খেয়াল করলে দেখবে কিছু পরপর দাগ দেওয়া আছে। এগুলোকে ফ্রেট বলে। এই একেকটা ফ্রেটে যখন আঙুল চেপে ধরি, তখন গিটারের ওই তারের মুক্ত অংশের দৈর্ঘ্য কমে যায়। আগে ছিল এ মাথা থেকে ও মাথা, এখন দৈর্ঘ্য হবে তুমি যেখানে আঙুল চেপে ধরেছ ওই পর্যন্ত। এমন হলে কম্পাঙ্ক বেড়ে যায়, তখন যেটা E ছিল সেটা হয়ে যায় F।

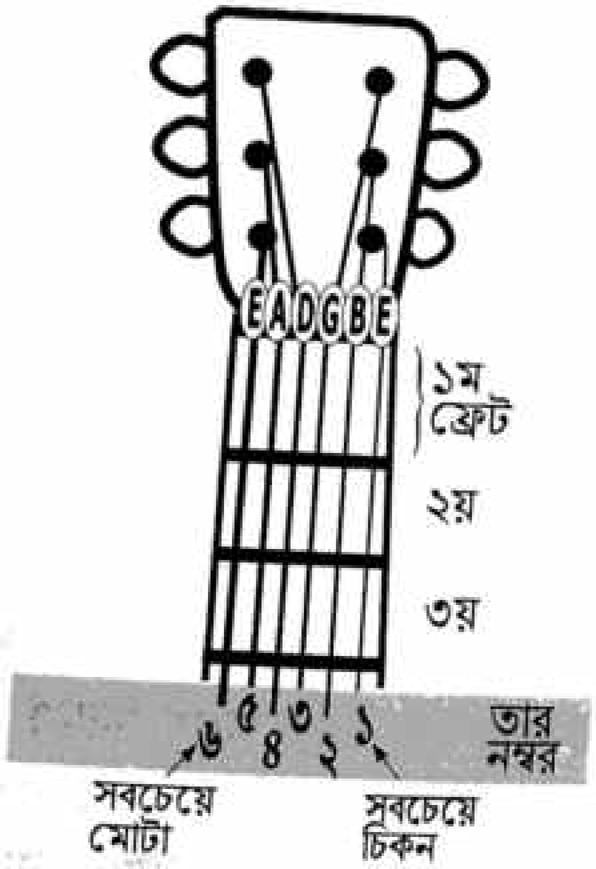

কোথাও আঙুল না চাপলে যে নোটগুলো বাজবে EADGBE - ওপেন

এখন দেখো, যখন কোনো আঙুলই চেপে ধরি না, তখন তারগুলোতে টোকা দিলে বাজে EADGBE। সবচেয়ে মোটা তারে E, এরপর A, তারপর D, এরপর G, B, এমন করে সবচেয়ে চিকন তারে আবার E। এখন যদি আমরা A Minor বাজাতে চাই, আমাদের লাগবে A C E। ছয়টা তারেই এই নোটগুলোর ভেতর থেকেই একটা না একটা বাজতে হবে। তিনটা তারে দেখো আগে থেকেই এগুলো আছে। সবচেয়ে মোটা বা ৬ নম্বর তারে আছে E, ৫ নম্বর তারে আছে A, আর ১ নম্বর তারে আছে E, এগুলোতে আর আঙুল চেপে ধরতে হবে না। কিন্তু অন্যগুলো?

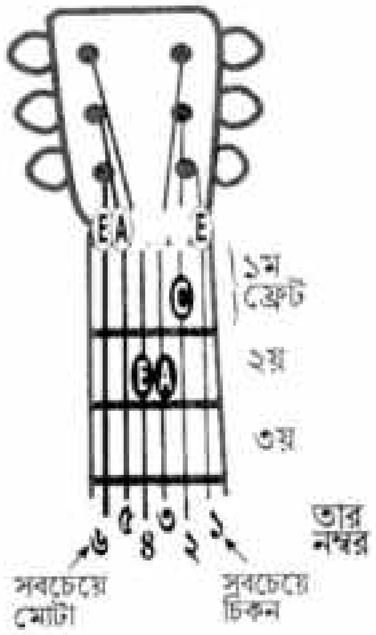

৪ ও ৩ নং তারে ২য় ফ্রেট, ২ নং তারে ১ম ফ্রেট চেপে বাজালে বাজবে E A E A C E - এর A Minor কর্ড

দেখো, ৪ নম্বর তারে কিছু না ধরলে পাবে D, কিন্তু এটা হলে তো A minor বাজবে না। যদি এই তারে প্রথম ফ্রেটে আঙুল চেপে ধরে বাজাও, বাজবে D-এর পরের নোটটা মানে, D# । এটাও A minor-এ নেই। এখন তার পরের ফ্রেটে আঙুল রাখি। D#-এর পরের নোট হলো E। বেশ, এটা আমাদের কর্ডে আছে। তাহলে এখানে একটা আঙুল চাপতে হবে।

এরপর ৩ নম্বর তারে কিছু না ধরলে পাবে G, কিন্তু এটা হলে তো A minor বাজবে না। যদি এই তারে প্রথম ফ্রেটে আঙুল চেপে ধরে বাজাও, বাজবে এ-এর পরের নোট G# । এটাও A minor-এ নেই। তাই তারও পরের ফ্রেটে আঙুল রাখি। G#-এর পরের নোট হলো A, এটা আমাদের কর্ডে আছে। তাহলে এখানে একটা আঙুল চাপতে হবে।

এরপর ২ নম্বর তারে কিছু না ধরলে পাবে B, কিন্তু যদি এই তারে প্রথম ফ্রেটে আঙুল চেপে ধরে বাজাও, বাজবে B-এর পরের নোট C। এটা A minor কর্ডে আছে। তাহলে এখানে আরেকটা আঙুল চাপতে হবে। এখন দেখো, ছয়টা তারে বাজছে E A E A C E। সবাই A minor কর্ডের কোনো না কোনো নোট। এভাবেই গিটারে A minor কর্ড ধরতে হয়। তোমাদের আগ্রহ থাকলে এখন যেকোনো কর্ড ধরতে পারবে। তবে... ।

তবে কী ভাইয়া?

যদি চর্চা না করো, তাহলে আমার মতো অবস্থা হবে। গণিতটা জানবে ঠিকই, কিন্তু বাজাতে আর পারবে না!

সবাই হাসল। পৃথ্বী বলল, গিটারের ভেতরেও যে এত অঙ্ক এটা দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

সংগীতে যত ধরনের যন্ত্র আছে সেগুলোর প্রায় সবই নিখুঁত গণিতের হিসাব মিলিয়ে করতে হয়। পিয়ানোর পেছনে যে বাঁকা অংশ থাকে, সেটাকে গণিতের সূচকের লেখচিত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। একই ভাবে বাঁশিতে ছিদ্রগুলো করতে হয় হিসাব কষে নিয়ম মেনে। আসলে কমবেশি সব সংগীতযন্ত্রেই বিষয়টা এমন। গিটারের ফ্রেটগুলো ভালো করে খেয়াল করলে দেখবে ওপরের ফ্রেটগুলো বেশি চওড়া, তারপর আস্তে আস্তে এর প্রশস্ততা কমে গেছে। আসলে কম্পাঙ্ক ঠিক রাখার জন্য এমন ভাবে ফ্রেটগুলো চওড়া করা হয়, যেন যেকোনো একটা ফ্রেট থেকে ব্রিজ পর্যন্ত দূরত্ব হয় পরের ফ্রেট থেকে ব্রিজের দূরত্বের $\sqrt[১২]{২}$ গুণ!

ওরেব্বাবা।

এবার তন্বী যোগ করল, ভাইয়া, আমার মনে হয় সংগীতের ভেতর আরেকটা গণিতের জায়গা আছে, সেটা হলো গানের তাল।

অবশ্যই, স্বরগুলো যদি একটার পর একটা এলোমেলোভাবে কানে আসে তাহলে অনুপাত মানলেও আসলে শুনতে ভালো লাগে না। এ জন্য ঠিক কতক্ষণ পরপর স্বরগুলো কানে আসবে, সেটা নিয়মিত হওয়া দরকার। সময়ের সেই হিসাবটাই হলো তাল। তালের একেকটা অংশ ছোট হিসাব করা হয় মাত্রা দিয়ে। ৮ মাত্রার কাহারবা তাল, ৬ মাত্রার দাদরা, ১৬ মাত্রার ত্রিতাল আরও কত নাম। হিসাব কিন্তু থাকছেই, গণিত সাথেই আছে।

বান্টি খোঁচা দিল, কিন্তু ভাইয়া, যে লোক গান করছে তার কি এত অঙ্ক জানার দরকার আছে? আপনার কি মনে হয় পড়শী, ইমরান এত অঙ্ক করে গান করে?

হা হা হা, না, করে না। গান করার জন্য গণিত জানতে হবে, এটা আমি আসলে বলতে চাইনি। আমি শুধু এটা বলতে চাচ্ছিলাম, গানের

গভীরেও গণিত লুকানো আছে। তুমি শ্বাস নেওয়ার সময় কি বারবার ফুসফুসের কথা ভাবো? বেঁচে থাকার স্পন্দনের জন্য কি বারবার হৃৎপিণ্ডকে ধন্যবাদ দাও? দাও না, তবে তারা তাদের কাজ ঠিকই করে যায় বলে তুমি বাঁচো।

অবশ্য গণিত থেকে পাওয়া আরেকটা ব্যাপার এখন সংগীতে খুব জরুরি হয়ে গেছে। এখন এই সময়ের তরুণ প্রজন্মের কাছে যেসব শিল্পী অনেক জনপ্রিয় তারা প্রায়ই সংগীত সৃষ্টিতে ব্যবহার করেন তাদের কম্পিউটারটিকে। এখন প্রযুক্তি এমন জায়গায় যে কোনো সংগীতযন্ত্র হাতে না বাজিয়েই শুধু একটা কম্পিউটারে কিছু সফটওয়্যার ব্যবহার করে পুরো সংগীত আয়োজন করে ফেলা যায়। শুধু সংগীতবিদদের দিয়ে কিন্তু এ কাজ সম্ভব হতো না। অসংখ্য সংগীতপ্রেমী গণিতবিদের বহু বছরের গবেষণার ফল ভোগ করছি আমরা।

ভাইয়া, একসময় কি যন্ত্রই সংগীত বানাবে?

সংগীত পুরোপুরি কৃত্রিম উপায়ে তৈরি সম্ভব কি না, এটা নৈতিক হবে কি না, সংগীত মানুষের মনকে (বা মস্তিষ্ককে) ঠিক কীভাবে নাড়া দেয়, সংগীত ছাড়াই সংগীতের অনুভূতি দেওয়া সম্ভব কি না—এমন অজস্র কাজ আসলে চলছে। তুমি যদি ভালোবাসো গণিত আর সংগীত দুটোকেই, একদিন তুমিই হয়তো পৃথিবীকে জানিয়ে দেবে অমন অনেক প্রশ্নের উত্তর!

অধ্যায় ৮

ত্রিকোণমিতির কিছু কথা

৮.১

ভাইয়া, আপনি স্যারের সাথে দেখা করতে যাবেন না। আপনাকে অনেক অপমান করবে। অপমান শুনলে আপনার অনেক কষ্ট হবে। কষ্টে আপনি শহর ছেড়ে ঢাকায় চলে যাবেন। তখন আমাদের কী হবে ভাইয়া? সামনে টেস্ট পরীক্ষা। এত দিন পরে আপনাকে পেয়ে একটু একটু শিখতে পারছিলাম। আপনি না থাকলে আমি ফেল করব। বাবা মা ধরে গ্রামে বিয়ে ...।

দাঁড়াও, দাঁড়াও, টিনা, অতদূর ভাবতে হবে না। তোমাকে কেউ বিয়ে দিয়ে দেবে না। আমার জন্য চিন্তা নিয়ো না। স্যার আমাকে অপমান করার সুযোগ পাবেন না।

৮.২

আজকে ত্রিকোণমিতি পড়ানো হবে শুনেই বান্টি হাত তুলল। তূর্য হেসে বলল, এই চারজনের ক্লাসে হাত তোলার কী দরকার, সরাসরি প্রশ্ন করে ফেলো! ভাইয়া, আমার একটা প্রশ্ন মেলা দিন ধরে। sin, tan, sec— ত্রিকোণমিতির এই নামগুলো কোথেকে এল?

সাইন, কস নামগুলো কোথেকে এল?

তূর্য জানে উত্তরটা। কদিন আগে একটা দারুণ বই পড়ছিলাম Great Moments in Mathematics before 1650। সেখানে খুব সুন্দর করে sin-এর গল্পটা বলা ছিল। উইকিপিডিয়া ঘেঁটে আরও কিছু শিখেছিলাম। ভালোই হলো তোমরা জানতে চাওয়ায়। যা জেনেছি, তোমাদের সাথে ভাগ করে নিই। চলো আগে নামগুলোর আভিধানিক অর্থ জেনে নিই। এই আভিধানিক অর্থ আমি আগেও জানতাম, কিন্তু সেই জানাটাই আসলে আমাকে আরও দ্বিধায় ফেলে দিয়েছিল!

sine (সংক্ষেপে আমরা লিখি sin) শব্দটা এসেছে লাতিন sinus থেকে, যার মানে হলো গর্ত বা গহ্বর! নাকের গহ্বরে প্রদাহ হলে তাকে sinusitis বলে, তখন প্রচণ্ড মাথাব্যথা হয়। তোমরা হয়তো তার কথা শুনেও থাকতে পারো।

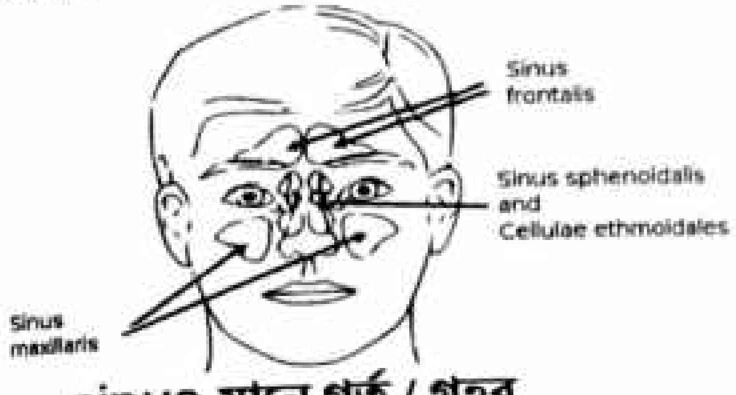

sinus মানে গর্ত / গহ্বর
এর সাথে sin এর কী সম্পর্ক??

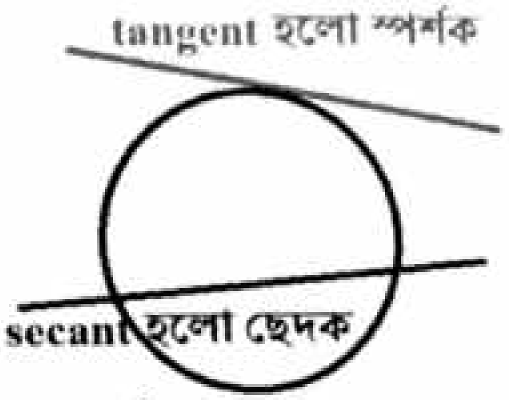

স্পর্শক, ছেদকের সাথে
লম্ব, ভূমি, অতিভুজের সম্পর্ক কী??

tangent (যাকে সংক্ষেপে আমরা লিখি tan) মানে হলো স্পর্শক। তোমরা জানো কোনো একটা সরলরেখা যখন কোনো বৃত্তকে একটা মাত্র বিন্দুতে ছুঁয়ে যায়, সেই রেখাটিকে বলে স্পর্শক রেখা। tangent শব্দটা এসেছে লাতিন tangere থেকে যার মানে স্পর্শ করা।

secant শব্দটার অর্থ হলো ছেদক। একটা সরলরেখা যখন বৃত্তের একপাশ দিয়ে ঢুকে অন্যদিক দিয়ে ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়, অর্থাৎ দুটো বিন্দুকে ছেদ করে বেরিয়ে যায় তাকে বলে ওই বৃত্তের ছেদক। এই নামটা এসেছে লাতিন secare শব্দটি থেকে; যার মানে হলো কেটে ফেলা, ছেদ করা।

co-sine বা cos, co-tangent বা cot এবং co-secant বা cosec (একে সংক্ষেপে csc-ও লেখা হয়)— এই নামগুলো আসলে sin,tan আর sec থেকেই এসেছে। cosine হলো sine-এর সাথি, cotangent

হলো tangent-এর সাথি এবং cosec হলো sec-এর সাথি। সাথি কী জিনিস সেটাতে একটু পরে আসছি। তার আগে নামগুলোর অর্থের দিকে আবার তাকাও।

স্পর্শক আর ছেদক নাহয় গণিতের ব্যাপার, এর সাথে tan আর sec কোনোভাবে মিলতেও পারে, কিন্তু গর্ত? এর সাথে sin-এর সম্পর্ক কী? মজার ব্যাপার হলো— সম্পর্ক আসলেই নেই। এটা একটা ভুল অনুবাদের ফসল!! একটা দারুণ ব্যাপার কী জানো, আমরা আমাদের চারপাশে যা কিছু দেখি তার সবকিছুই যে একেবারে সঠিক নিয়ম মেনেই এসেছে তা কিন্তু না। কিছু অদ্ভুত সুন্দর 'ভুল' হয় বলেই আমাদের পৃথিবীটা অনেক বেশি বৈচিত্র্যময়। যাহোক, এপর্যায়ে পুরোনো ব্যাপারগুলো আরেকবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক। একটা সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলো থেকে দুটো দুটো করে নিয়ে মোট ছয় রকম অনুপাত পাওয়া সম্ভব। এই অনুপাতগুলোর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে—

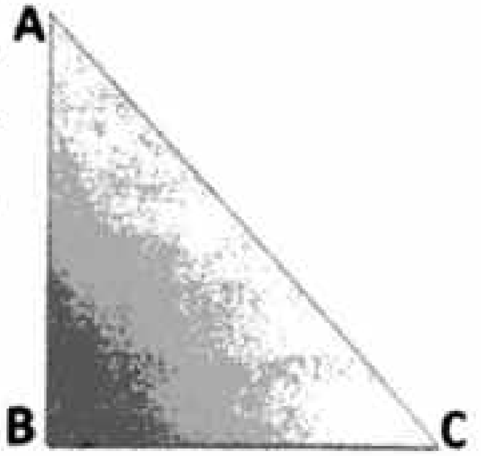

$\sin\theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}}\ \cos\theta = \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতিভুজ}}\ \tan\theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}}$

$\cot\theta = \frac{\text{ভূমি}}{\text{লম্ব}}\ \sec\theta = \frac{\text{অতিভুজ}}{\text{ভূমি}}\ \csc\theta = \frac{\text{অতিভুজ}}{\text{লম্ব}}$

অতিভুজ হলো সবচেয়ে বড় বাহুটা। যেমন ছবিতে AC হলো অতিভুজ। আচ্ছা বলো দেখি লম্ব আর ভূমি কোনটা হবে?

কেন ভাইয়া, BC হবে ভূমি আর AB হবে লম্ব!

উঁহু, এটা নাও হতে পারে! তোমার কোনো দোষ নেই। বাচ্চাদের অনেক সময়ই ঠিকমতো শেখানো হয় না। অনেকের মনেই ভুল ধারণা থাকে যে মাটি বরাবর অর্থাৎ অনুভূমিকভাবে যে বাহুটা শুয়ে আছে, সেটাই সব সময় ভূমি আর তার ওপর লম্বা যে দাঁড়িয়ে আছে, সেই হলো লম্ব। কিন্তু মূল ব্যাপারটা এমন না। আসলে অতিভুজকে বাদ দিলে অন্য দুটো বাহুর যেকোনো একটা লম্ব আর আরেকটাকে ভূমি ধরা যেতে পারে। তবে কোনটাকে আমরা ভূমি বলব, সেটা নির্ভর করবে কোন কোণটিকে নিয়ে আমরা কাজ করছি সেটার ওপর।

সমকোণ তো সব সময়ই সমকোণ —এটা নিয়ে এখানে আসলে ভাবার কিছু নেই। বাকি যে সূক্ষ্মকোণ দুটো রইল তাদের নিয়েই আমাদের যত চিন্তা। এখানে ∠BAC এবং ∠BCA হলো এমন দুটো কোণ। প্রথমে আমরা ∠BAC-এর কথা চিন্তা করি। দেখো এ কোণটি AC এবং AB এই দুটো বাহু মিলে তৈরি। AC তো অতিভুজ। এখন এই AC-এর সাথে আর যে বাহুটি রয়েছে, সেটিই হবে 'ভূমি' অর্থাৎ এখানে AB হলো ভূমি। নিখুঁত করে বললে বলা যায় ভূমি হলো 'কোণ সংলগ্ন বাহু'। এ ক্ষেত্রে লম্ব হবে BC (আর কে হবে বলো, আর কেউ কি বাকি আছে??)। লম্বকে তাই বলা যায় 'কোণের বিপরীত বাহু'। তাহলে $\sin BAC = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}} = \frac{\mathrm{BC}}{\mathrm{AC}}$। একইভাবে $\cos BAC = \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতিভুজ}} = \frac{\mathrm{AB}}{\mathrm{AC}}$

এখন যদি আমরা অন্য কোণটি অর্থাৎ ∠BCA-এর কথা ভাবি, তখন আমরা দেখব ভূমি হয়ে গেছে BC এবং লম্ব হয়ে গেছে এর বিপরীত বাহু AB। এবার $\sin BCA = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}} = \frac{\mathrm{AB}}{\mathrm{AC}}$। এবং $\cos BCA = \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতিভুজ}} = \frac{\mathrm{BC}}{\mathrm{AC}}$।

এবারে লক্ষ করো, cos BAC-এর মান যা, sin BCA-এর মানও তা। আবার sin BAC-এর মান যা, cos BCA-এর মানও তা। একই সমকোণী ত্রিভুজে থাকা এমন সূক্ষ্মকোণ দুটোকে বলে পরস্পরের পূরক কোণ (complementary angle)। এমন একটা কোণের সাইন অন্য কোণের কোসাইনের সমান। সাথি অর্থাৎ co ব্যাপারটা আসলে এখান থেকেই এসেছে। সুতরাং অনুমান করতে পারো এভাবে একটা কোণের সেকান্ট হবে অন্য কোণটির কোসেক্যান্টের সমান এবং একটা কোণের ট্যানজেন্ট হবে অন্য কোণটির কোট্যানজেন্টের সমান।

আবার ফিরে যাই মূল প্রসঙ্গে— সাইন যদি লম্ব আর অতিভুজের অনুপাত হয়, সেখানে গর্ত কোত্থেকে এল? সেক্যান্ট মানে যদি ছেদকই হবে তার সাথে অতিভুজ আর ভূমির অনুপাতের সম্পর্ক কী? ট্যানজেন্ট দিয়ে বোঝায় লম্ব আর ভূমির অনুপাত, তার সাথে স্পর্শকের সম্পর্ক কোথায়?

এই চিন্তাগুলোর জন্ম হয়েছিল গ্রিসে আর আদরে আদরে বেড়ে উঠেছিল আমাদের এই উপমহাদেশে। এখন থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে

আর্যভট (৪৭৬-৫৫০ খ্রিষ্টাব্দ) তার 'সূর্যসিদ্ধান্ত' বইটির মধ্যে লিখে গেছে এ বিষয়গুলোর কথা। তার ধারণা বুঝতে গেলে আমাদের এমন একটা বৃত্তের দিকে তাকাতে হবে, যার ব্যাসার্ধ ১ একক। ছবিতে আমরা এমন একটা বৃত্ত এঁকেছি। এখানে OB=OD= বৃত্তের ব্যাসার্ধ= ১ একক। AB হলো BB', জ্যা-এর অর্ধেক। একে বলা হয় অর্ধ-জ্যা। CC', এই বৃত্তের একটা ছেদক। এর একটা অংশ হলো OC। এখানে ছেদক বা ছেদকের দৈর্ঘ্য বলতে আমরা OC অংশটুকুকেই বুঝব। আর স্পর্শক বলতে বুঝব CD। এবারে আমরা পুরোনো সংজ্ঞাগুলোর দিকে আবার তাকাব। কোণ COD-কে আমরা θ নাম দিলাম। তাহলে ΔCOD থেকে আমরা দেখি—

$$\sec\theta = \sec COD = \frac{\text{অতিভুজ}}{\text{ভূমি}} = \frac{OC}{OD} = \frac{\text{ছেদক}}{\text{ব্যাসার্ধ}} = \frac{\text{ছেদক}}{১} = \text{ছেদক}$$

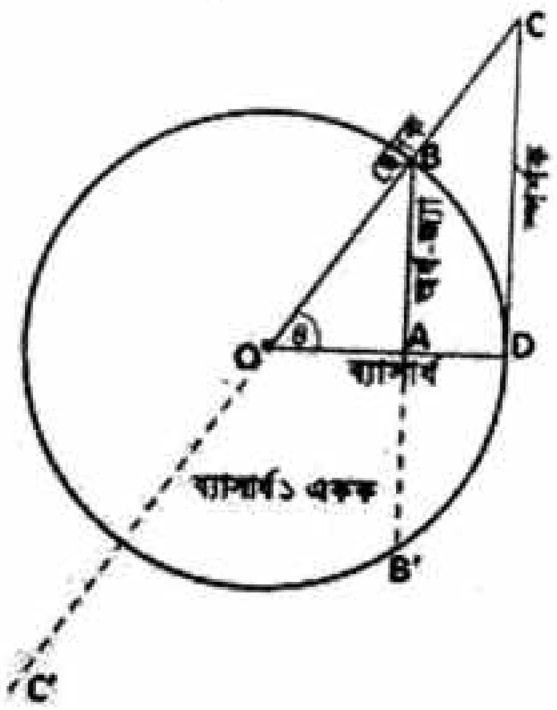

যাক বাবা, এতক্ষণ পরে আমরা দেখাতে পেরেছি, সেক্যান্ট আসলেই ছেদকের মান বের করে। এখন tangent—ও আমাদের হতাশ করবে না!

$$\tan\theta = \tan COD = \frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}} = \frac{CD}{OD}$$
$$= \frac{\text{স্পর্শক}}{\text{ব্যাসার্ধ}} = \frac{\text{স্পর্শক}}{১} = \text{স্পর্শক}$$

আর বাকি রইল sin। সাইনকে আর্যভট আসলে অর্ধ-জ্যা বলে ডাকতেন। কেন্দ্রে বিভিন্ন রকম কোণের জন্য অর্ধ-জ্যা-এর মান কেমন হবে তার একটা বিশাল লিস্টি তিনি বানিয়েছিলেন। যাহোক, ΔBOA থেকে আমরা sinθ-এর মান বের করি।

$$\sin\theta = \sin BOA = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}}$$
$$= \frac{\text{অর্ধ-জ্যা}}{\text{ব্যাসার্ধ}} = \frac{\text{অর্ধ-জ্যা}}{১} = \text{অর্ধ-জ্যা}$$

sin যে অর্ধ-জ্যাকে প্রকাশ করে এটা জেনেও আসলে স্বস্তি হয় না। অর্ধ-জ্যা-এর সাথে 'গর্ত' ব্যাপারটা কীভাবে মিলল? এখানে আসলে অনুবাদকদের কারসাজি। আর্যভট অর্ধ-জ্যাকে কখনো কখনো 'জ্যা-অর্ধ' আবার কখনো কখনো শুধু 'জ্যা' লিখতেন। আরব অনুবাদকেরা ভারতবর্ষের গণিতের কাজগুলো যখন সংস্কৃত থেকে আরবিতে অনুবাদ করছিলেন, তারা দেখলেন আরবিতে 'জ্যা'-এর কোনো প্রতিশব্দ নেই। তারা উচ্চারণের সাথে মিল রেখে এটার নাম দিলেন 'যিবা' (জ্যা → যিঅ্যা → যিবা)। তোমরা হয়তো জানতেও পারো, আরবিতে যখন মানুষ লেখে, অনেক সময়ই তারা আকার-ওকার না দিয়ে অর্থাৎ যের, যবর, পেশ ব্যবহার না করেই লিখে ফেলে। ফলে তারা লিখল 'য ব'। পরবর্তী প্রজন্মের লেখকেরা যখন এই 'য ব' শব্দটা দেখলেন, তারা আর বুঝতে পারলেন না যে এটা হলো 'যিবা'। তারা দেখলেন য আর ব-এর সাথে আকার-ইকার বসিয়ে সুন্দর একটা আরবি শব্দ হয় 'যাইব', যার মানে হলো খাদ বা গর্ত। এরপর লাতিন ভাষার অনুবাদকেরা যখন অনুবাদ করলেন, তারা লাতিন ভাষায় গর্তের প্রতিশব্দ হিসেবে এর নাম রাখলেন sinus, তার থেকেই পরবর্তীতে এল sine. এভাবেই আর্যভটের সেই অর্ধ-জ্যা অর্ধদুনিয়া ঘুরে হয়ে গেল গর্ত!

পৃথ্বী মাথা নাড়ল, কী অদ্ভুত, কী অদ্ভুত! নামটা কোত্থেকে এল না জেনেই কত সব সমস্যা সমাধান করে ফেললাম!

ত্রিকোণমিতি কোন কাজে লাগে?

টিনা বলল, ভাইয়া, ত্রিকোণমিতির এই যে বিশাল বিশাল সমস্যার সমাধান করি আমরা। এগুলো আসলে বাস্তবে কী কাজে লাগে? আমাদের প্রথাগত পড়াশোনায় তো আর এ প্রশ্ন করা যায় না, করলে উত্তর আসে— নম্বর পাবা তাই। যদি উত্তরগুলো জানতে পারতাম, একটু হলেও কষ্ট ঘুচত।

আমরা যখন ফোনে কথা বলছি, এগুলো শব্দতরঙ্গ থেকে তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ হয়ে যায়। অল্প ফ্রিকুয়েন্সির সেই তরঙ্গকে হাই ফ্রিকুয়েন্সির ক্যারিয়ার তরঙ্গের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। তরঙ্গের এসব হিসাব করা হয় $\sin\theta$, $\cos\theta$ এসব ব্যবহার করে। এদের নিয়ে হিসাব করা অনেক সহজ। তাই যেসব সিগনাল দেখতে সাইন কস-এর মতো না, তাদেরও সাইন কস বানিয়ে ফেলা হয়। সেটার নিয়মটা বের করেছিলেন

গণিতবিদ জোসেফ ফুরিয়ার। মোবাইল ফোনের যে ডিসপ্লে তোমরা অহরহ দেখো, শুধু সেটা সম্পর্কে জানতে গেলেও তুমি অবাক হয়ে যাবে। কোথায় অক্ষরগুলো দেখা যাবে, তার জন্য লাগবে ত্রিকোণমিতি এবং জ্যামিতি।

ধন্যবাদ ভাইয়া, এখন মনে হচ্ছে ত্রিকোণমিতি আসলেই কাজে লাগে। আমাদের বইয়ে অবশ্য ভবনের উচ্চতা নির্ণয়ের ব্যবহার নিয়ে অঙ্ক আছে। সেই অঙ্কটা করতে গিয়ে সেদিন একটা প্রশ্ন মাথায় এসেছিল, $\sin A = \sin 30°$ হলে কেন $A = 30°$ লেখা হয়, এখানে = চিহ্নের উভয় দিক হতে sin কাটা যায়, নাকি অন্য কিছু, এর সঠিক ব্যাখ্যা কী?

সাইন আর সাইন কি কাটাকাটি যায়?

তূর্য বলল, না, এটা আসলে কাটা যায় না। 30° হলো একটা সমাধান, তবে সত্যি হলো এ ক্ষেত্রে A-এর অসীম সংখ্যক সমাধান রয়েছে। তাদের সাধারণভাবে $A = 180n + (-1)^n . 30$ আকারে লেখা যায়, যেখানে n পূর্ণসংখ্যা। যদি বলে দেওয়া থাকে বা জানা থাকে A একটা সূক্ষ্মকোণ, শুধু তাহলেই বলা যায় $A = 30°$।

আরেকটু বুঝিয়ে বলবেন?

ব্যাপারটা সম্পর্কে একটু ধারণা দিতে পারি। দেখো, sin 30°-এর মান হলো ½। তাহলে সমীকরণটাকে ভাবা যায় $\sin A = ½$। চতুর্ভাগের হিসাব তো তোমরা জানো, সেখান থেকে বলা যায় sin 30° ও যা, sin 150°-এর মানও তাই। আবার sin 390°-এর মানও তাই, এরপর sin 510°-এর মানও একই। ভালো করে দেখো

$$\sin 30° = \sin 150° = \sin 390° = \sin 510° = \ldots$$

এখান থেকে তাকালে A-এর মান 30°, 150°, 390°, 510° সবাই হতে পারে। এবার যদি খেয়াল করো ১৮০ ডিগ্রির গুণিতকগুলো থেকে এই কোণগুলো কত দূরে, দেখবে ওপরের লাইনটাকে এভাবে লেখা যায়—

$$\sin (180 \times 0 + 30) = \sin (180 \times 1 - 30)$$

$$= \sin (180 \times 2 + 30) = \sin (180 \times 3 - 30)$$

১৮০-এর জোড় গুণিতক হলে তার পাশে বসছে প্লাস চিহ্ন, আর বিজোড় গুণিতক হলে মাইনাস চিহ্ন। এটাকেই $180n + (-1)^n . 30$ আকারে লেখা হয়। $(-1)^n$ এর কাজই হলো চিহ্ন পরিবর্তন করা। জোড় হলে ধনাত্মক, বিজোড় হলে ঋণাত্মক। এখান থেকে সাধারণ সমাধান এভাবে ভাবা হয়— $\sin A = \sin \theta$ হলে, $A = n\pi + (-1)^n \theta$, এবার রেডিয়ানে লিখলাম। এটাই বেশি প্রচলিত।

ভাইয়া, এ তো শুধু সাইনের ব্যাপার। আর cos, tan এদের ক্ষেত্রে?

$\cos A = \cos \theta$ হলে, $A = 2n\pi \pm \theta$

$\tan A = \tan \theta$ হলে, $A = n\pi \pm \theta$

তন্বী জিজ্ঞেস করে, ভাইয়া, আমরা তো sin 30-এর মান জানি। এভাবে ৪৫, ৬০, ৯০, ০ এদের মান জানি। কিন্তু যেকোনো কোণ যেমন 51°, 13°, 11°, 71° এমন হাবিজাবি কোণগুলোর sin, cos-এর মান বের করার আসল পদ্ধতি কী? যারা বের করেছে, কীভাবে করেছে?

sin13°, sin71° এমন যেকোনো কোণের মান কীভাবে পাওয়া যাবে?

তূর্য বলল, যেকোনো পূর্ণসংখ্যার কোণের জন্য সাইন কস-এর মান বীজগণিত আর জ্যামিতি দিয়ে বের করা যায়। তুমি যদি ১ ডিগ্রির জন্য এদের মান বের করতে পারো, তাহলে যেকোনো ডিগ্রির জন্য মান পাবে, sin(A+B), sin (A-B) এমন সূত্রগুলো ব্যবহার করে। ১ ডিগ্রির মান বের করা খুব সহজ না। তবে করা যায়।

৪৫ আর ৩০ ডিগ্রির জন্য তো জানই, সমকোণী ত্রিভুজ থেকে মান পাওয়া যায়। সেখান থেকে sin (A-B) থেকে পাওয়া যায় ১৫ ডিগ্রির জন্য। পঞ্চভুজ থেকে পাওয়া যায় ১৮ ডিগ্রির জন্য মান। ১৮ আর ১৫ পাওয়া গেলে পাওয়া যায় ৩ ডিগ্রির জন্য। সেখান থেকে sin 3A-এর সূত্র থেকে ত্রিঘাত সমীকরণ সমাধান করে পাওয়া যায় sin 1।[৫] sin পেলে তো cos পাওয়াই যায় $\sqrt{(1-\sin^2\theta)}$ থেকে।

---

[৫] আরও জানতে চাইলে এই লিঙ্ক থেকে হিসেবটা দেখতে পারেন—
http://www.efnet-math.org/Meta/sine1.htm

আর এমনিতে দুইটা সহজ অসীম ধারা আছে, যেগুলো দিয়ে যেকোনো রেডিয়ান কোণের জন্য এদের মান মোটামুটি নিখুঁতভাবে অনুমান করা যায়। x রেডিয়ান হলে,

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

তোমরা যখন একটু বড় হবে, ক্যালকুলাস শিখবে। সেখানে ম্যাকলরিনের ধারা বলে একটা ব্যাপার আছে, ওখান থেকে এই ধারাগুলোর প্রমাণ জানতে পারবে। এটুকু বলে অঙ্ক ভাইয়া একটু থামল। তারপর বলল, এই ধারা দুটো দেখে তোমাদের আরেকটা জিনিস বলতে ইচ্ছা করছে, হয়তো তোমরা এখনই বুঝবে না। তোমরা কি কাল্পনিক সংখ্যা বা জটিল সংখ্যার নাম শুনেছ?

কাল্পনিক সংখ্যা কী?

তূর্য ভেবেছিল কেউ শোনেনি, কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে পৃথ্বী বলল, ভাইয়া, ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূলগুলো কাল্পনিক, তাই না?

বাহ, তুমি জানো দেখি! হ্যাঁ, ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূলকে বাস্তব জগতে দেখা যায় না, কিন্তু গণিতের অনেক অসাধারণ কাজ এরা করে ফেলে। এদের সরদার হলো -১-এর বর্গমূল, যাকে imaginary শব্দের প্রথম অক্ষর i দিয়ে প্রকাশ করা হয়। $i = \sqrt{-1} \therefore i^2 = -1$। যে জন্য এটুকু বলা, একটু আগের যে ধারা দুটো দেখলে, এদের ব্যবহার করে একটা অসাধারণ সম্পর্ক তৈরি করে দিয়েছিলেন মহান গণিতবিদ অয়লার। তোমরা তো স্বাভাবিক লগারিদমের ভিত্তি e-এর নাম শুনেছ। সেটার একটা ধারা আছে,

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^6}{6!} + \dots$$

এটা দেখো, আর ওপরের দুইটা দেখো, মনে হয় যেন ওপরের দুটো মিলিয়েই এটা তৈরি। শুধু প্লাস-মাইনাসে ঝামেলা আছে। অয়লার i ব্যবহার করে দেখালেন,

$$e^{ix} = 1 + \frac{ix}{1!} + \frac{i^2x^2}{2!} + \frac{i^3x^3}{3!} + \frac{i^4x^4}{4!} + \frac{i^5x^5}{5!} + \frac{i^6x^6}{6!} + \dots$$

$$\therefore e^{ix} = 1 + \frac{ix}{1!} - \frac{x^2}{2!} - \frac{ix^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{ix^5}{5!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

এখানে আমি মাঝেমধ্যে $i^2 = -1$ ব্যবহার করেছি। এটাকে সাজিয়ে অয়লার লিখলেন,

$$e^{ix} = (1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots) + i(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots)$$

বা, $e^{ix} = \cos x + i \sin x$, এটা মানব ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক সম্পর্কগুলোর একটা। এখানে x-এর মান π রেডিয়ান বসালে একটা দারুণ ব্যাপার ঘটে। পাই রেডিয়ান হলো ১৮০ ডিগ্রি। cos ১৮০ ডিগ্রির মান হলো -১ আর sin ১৮০ ডিগ্রি শূন্য। এগুলো বসিয়ে পক্ষান্তর করলে যেটা পাওয়া যায়, তাকে বলে পৃথিবীর সুন্দরতম সমীকরণ। সংবাদমাধ্যমে, মানুষের ভোটাভুটিতে, সমীকরণের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় বেশ কয়েকবার বিজয়ীর মুকুট পরেছে এই অপরূপ রূপ লাবণ্যময় সমীকরণ[৬] $e^{i\pi} + 1 = 0$

গণিতের সুন্দরতম সমীকরণ

সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল সমীকরণটার দিকে। পুরো প্রতিপাদনটা বোঝেনি। কিন্তু ওরা দেখল একটামাত্র সমীকরণ, তার মাঝে কত অসাধারণ সব ব্যাপার— সংখ্যাদের ভেতর যারা রথী-মহারথী সেই e, i, π, ১, ০-কে নেই?

কিন্তু এর ভেতরে কি কোনো গূঢ় অর্থ আছে? অঙ্ক ভাইয়া বলল, অবশ্যই আছে, তবে সেটা বুঝতে তোমাদের আরেকটু বড় হতে হবে।

ওরা অপেক্ষা করতে লাগল আরেকটু বড় হওয়ার যখন এই সমীকরণের অর্থ বুঝে ফেলা যাবে।

---

[৬] http://www.bbc.com/earth/story/20160120-the-most-beautiful-equation-is-eulers-identity

অধ্যায় ৯

মুখোমুখি অঙ্ক ভাইয়া আর নজিবুল্লাহ মাস্টার

৯.১

হ্যাঁ, ভেতরে আসো। দরজাটা ভিড়ায়ে দাও। বসো। কী নাম যেন? তূর্য?

জি স্যার।

হুম। বুয়েটে পড়ো, বিরাট ভাব, না? গণিত অলিম্পিয়াড করে বেড়াও। অঙ্কের নাকি জাহাজ। ছেলেপেলেদের উল্টাপাল্টা প্রশ্নের উত্তর দাও। ভালো, খুব ভালো! এই ছেলে, তুমি যে চারটা ছেলেমেয়ের জীবন নষ্ট করে দিচ্ছ, সেটা টের পাও? অ্যাই দরজার বাইরে কে রে? অ্যাই! বাইরে বান্টিরা চারজন চুপিচুপি দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করছিল। স্যার টের পেয়েছে বুঝতেই ভয়ে দৌড় দিল ওরা। নজিবুল্লাহ সাহেব আবার ফেরেন তূর্যের দিকে,

আজ বাদে কাল টেস্ট পরীক্ষা বাচ্চাগুলার। ওদের শেখা দরকার কীভাবে অঙ্কগুলো খাতায় লিখবে। আর এখন তুমি শেখাচ্ছ কোনটা কী কাজে লাগে, কী কোত্থেকে এল— এই সব আবোলতাবোল। এসব শিখিয়ে লাভ আছে? তূর্য যেহেতু সরাসরি ছাত্র না, রাগটা যতটা পারা যায় নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন নজিবুল্লাহ।

একদিন আগেও তূর্য ভেবেছিল, স্যারকে অনেকগুলো কথা শুনিয়ে দেবে, জ্ঞান দেবে। এখন স্যারের সামনে পড়ে সে একেবারে চুপ করে রইল, মাথা নিচু। গতকাল সন্ধ্যায় নজিবুল্লাহ স্যারের কয়েকটা গোপন কাহিনি শুনেছে সে, এক বন্ধুর কাছ থেকে। তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, স্যারের কোনো কথার জবাব সে দেবে না। স্যার তূর্যকে চুপ দেখে গলা আরেকটু চড়ান। তুমি অলিম্পিয়াড করে বেড়াও, সারা দেশে জ্ঞান দাও, ভালো কথা— আমার স্কুলের কাউকে তোমার জ্ঞান দেওয়ার দরকার নাই।

তূর্য বলতে পারত, সে তো সেধে জ্ঞান দিতে চায় নাই, ওদের মায়েরাই তূর্যের মাকে বলেছিলেন আর সেটাও বলেছিলেন আপনার কারণে। তূর্য তবু কিছু বলে না। নজিবুল্লাহ সাহেবের গলা আরও চড়তে থাকে। তূর্যের কানে কিছুই প্রবেশ করে করে, সে অবাক দৃষ্টিতে স্যারের দিকে তাকিয়ে থাকে, বোঝার চেষ্টা করে একটা মানুষকে। বেশ খানিকক্ষণ পর স্যারও ক্লান্ত হয়ে আসেন, কী হলো, জবাব দিচ্ছ না কেন? খুব নাকি স্মার্ট তুমি, বিতর্কও করে বেড়াও শুনলাম। বলো, উল্টাপাল্টা জিনিসপাতি শিখায়ে কী লাভ, যুক্তি দাও। এরপর তূর্য যেটা করল সেটা কেউই কল্পনা করেনি।

তূর্য চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়, হাতজোড় করে, নতমুখে স্যারকে বলে, স্যার, আমি আজকে আসলে বিতর্ক করতে আসি নাই। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। নজিবুল্লাহ সাহেবকে হতভম্ব দেখায়।

আপনার ছাত্রছাত্রী, সবার কাছে শুধু শুনেছি আপনি কত ভয়ংকর। আপনার যত গল্প শুনেছি সবগুলোতে আপনাকে বলা হয়েছে নিষ্ঠুর। সেই গল্প শুনতে শুনতে মনে হয়েছে— কী খারাপ একজন মানুষ আপনি। একদিন আগেও ভেবেছি আপনাকে কত কথা শুনিয়ে দেব। কিন্তু কালকে যখন আপনার কথা শুনলাম... স্যার আমাকে মাফ করে দেবেন, আমি আপনাকে চিনতে পারি নাই। তূর্য কী শুনেছে নজিবুল্লাহ বুঝতে পারেন না। তার হতভম্ব ভাবটা কাটে না। তূর্য নিজেকে সংবরণ করে বলে—

আমি আপনার স্কুলে পড়ি নাই, স্যার। আমি ছিলাম জিলা স্কুলে। তিন বছর আগের একটা ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমার বন্ধু ইমন পড়ত আপনার স্কুলে। খুব গরিব ছিল ওরা, অভাবী সংসারের

[illegible] ছিল ওর বাবা। তার যখন লিভারে ক্যানসার ধরা পড়ে, আমরা বন্ধুরা অনেক জায়গায় হাত পেতেছি। অনেক নামীদামি লোক আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছে। কুড়িয়ে কাড়িয়ে যা পেলাম, তাতে হিসাব করে দেখলাম বাইরে নিয়ে যেতে আরও অন্তত বিশ হাজার টাকা লাগে। আমরা বন্ধুরা ওই দিন অনেক কেঁদেছিলাম, প্রিয় বন্ধুকে সাহায্য করতে না পারার কষ্টে। পরদিন খবর পাই, ইমনের বাবার অ্যাকাউন্টে কে যেন বিশ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। খোঁজ করেও পাইনি, কে দিল। আমরা অনেক দোয়া করেছিলাম পরিচয় না জানা মানুষটার জন্য। কাল শম্ভু আমাকে বলেছে, ওই টাকাটা দিয়েছিলেন আপনি। প্রতিবছর অন্তত চারজন ছাত্রছাত্রীর রেজিস্ট্রেশনের টাকা শম্ভু দিয়ে দেয়, সেটা শম্ভুকে দেন আপনি। রেজিস্ট্রেশনের টাকা নাই বলে পরীক্ষা দিতে পারেনি, এ ঘটনা কোনো দিন আপনার স্কুলে হয়নি। শম্ভু বলেছে, বৃষ্টি হলে স্কুলের একটা ঘরে ছাদ দিয়ে পানি পড়ত, সেটা আপনি নিজের টাকায় মেরামত করেছেন অন্য লোকের নাম দিয়ে। কেউ ধারণাও করেনি, এটা আপনার কাজ হতে পারে।

এসব কথা কে বলল তোকে? দ্রুত রাগ পড়ে যায় স্যারের। শান্তগলায় তুমি থেকে তুইয়ে নেমে আসেন। এই 'তুই' তাচ্ছিল্যের না, মমতার।

স্যার, শম্ভু আমাকে বারবার বলেছে, আপনি ওকে বলতে নিষেধ করেছেন। কালকে আড্ডায় আমি আপনাকে নিয়ে অনেক খারাপ খারাপ কথা বলছিলাম, আপনাকে আজ কী কী কথা শোনাব সেসবের বয়ান দিচ্ছিলাম। সবাই আমাকে আরও উসকে দিচ্ছিল, কেবল শম্ভু ছাড়া। ও চুপ করে ছিল। তারপর আমি যখন ফিরে আসছিলাম, ও ডাক দিয়ে আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়েছিল। আমি জানতাম না, শম্ভু আপনার ডান হাত, আপনার সব সাহায্য ও-ই চরম গোপনীয়তায় সবার কাছে পৌঁছে দেয়। আপনাকে ভীষণ শ্রদ্ধা করে ও। আমাকেও খুব পছন্দ করে। আমার কাছ থেকে আপনার নামে এসব কথা শুনে ও আর চুপ থাকতে পারেনি। খুব মন খারাপ করেছিল। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে সব বলে দিয়েছিল।

সব শুনে আমার মনে আর কোনো যুক্তি কাজ করে নাই। নিজেকে

অপরাধী মনে হয়েছে। ওপর থেকে একটা মানুষকে কত কিছুই না ভাবা যায়। স্যার, আমাকে ক্ষমা করবেন, আপনার মতো একজন মানুষকে নিয়ে কত খারাপ কথা আমি বলেছি! যে মানুষটা ছাত্রছাত্রীদের জন্য এত করেন, ওদের নিয়ে থাকার জন্য যে মানুষটা বিয়েটাও করেননি, অডিটের সময় স্কুলের নাম যেন খারাপ না হয়, তার জন্য যে মানুষটা দিনের পর দিন স্কুলেই থেকেছেন, এত ভালো যার অনার্সের রেজাল্ট, যে চাইলেই নামকরা কোম্পানির সিইও হতে পারত, যে মানুষটা তার ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে জীবন পার করে দিয়েছেন এই মফস্বলের স্কুলে— আমি তাকে নিয়ে কী সব কথা বলেছি, তারই আদরের ছাত্রছাত্রীদের কাছে! বলে তূর্য মুখ নিচু করে ফেলে, ওর গলা ধরে আসে অপরাধবোধে।

পাহাড়ের মতো কঠিন মানুষ ঝরনার মতো তরল হয়ে গলে পড়েন এবার। উঠে এসে তূর্যের মাথায় হাত রাখেন। বাবারে, আমার এই এত বছরের জীবনে কেউ কোনো দিন এভাবে বলে নাই। জীবনের সবই তো এই বান্দরগুলাকে মানুষ করতে দিয়ে দিলাম। অথচ ওরা আমারে কী ভয় পায়, ঘেন্না করে। আমারও তখন জিদ লাগে আরও। মনে হয়, ভয় যখন পাসই, ভয়ের চূড়ান্তটাই আমি দেখাব। তাই বলে ওদের কোনো দিন খারাপ চাই নাই, বাবা। ওদের রেজাল্ট দেখ, সব কয়টা গণিতে এ প্লাস পায়। আমি জানি ওরা কোনো রকম দুর্নীতি না করেই এ প্লাস পায়। ওদের জন্য কত করি, ওরা ওই সব কোনো দিনো বুঝবে না। আমিও ধার ধারি না, কে কী বলল তার, ওরা জীবনে ভালো করলেই আমি খুশি!

তূর্য এবার বলে, স্যার, আমার অনেক হিসাব মেলে না। আপনার মতো মানুষ একটা ছেলেকে একটা প্রশ্নের জন্য ফেল করিয়ে দেবে কেন?

স্যার হাসেন, সবাই এটাই বলে, না? শোন, দুনিয়ার কোনো শিক্ষক প্রশ্ন করার জন্য কাউকে ফেল করায় না। বান্টির কথা বলিস তো? ওই বজ্জাতটা আমার অনেক আদরের। কী করব, আদরটা দেখাতে পারি না, মানুষটাই হয়ে গেছি এমন। শাস্তি দিয়ে আদর বোঝাই। ছেলেটার অঙ্কের মাথা অনেক ভালো। কিন্তু বাপ-মা তো খবর রাখে

না— বান্দরটা কয়েক মাস ধরে শহরের সবচেয়ে খারাপ ছেলেগুলোর সাথে মিশছিল। এক-দুইবার একসাথে গাঁজার আড্ডাতেও গেছে শুনেছি। ওকে একটা ধাক্কা দেওয়া খুব দরকার ছিল। চাইলে টেনেটুনে পাস করাতে পারতাম। কিন্তু তাহলে ও মনে করত, পাস তো করেই যাচ্ছি। ও কিন্তু খালি আমার বিষয়েই না, অন্য বিষয়গুলোতেও খারাপ করেছে। অথচ ওর মতো ছেলের কত ভালো রেজাল্ট করা উচিত। দরজার বাইরে একটা ফোঁপানো কান্নার আওয়াজ পাওয়া যায়, অন্যরা না এলেও বান্টি আবার লুকিয়ে আড়ি পেতেছিল বাইরে, শুনতে চেয়েছিল ওদের কথোপকথন। স্যার ওকে এত ভালোবাসেন ব্যাপারটা ও কল্পনাও করতে পারেনি, নিতে পারেনি। দরজার বাইরে আওয়াজ শুনে আবার হাঁক দেন নজিবুল্লাহ, অ্যাই, দরজায় কে রে? বান্টি চোখ মুছতে মুছতে সরে যায়।

অঙ্ক ভাইয়ার হিসাব মেলে এইবার। নিজেকে সামলে নিয়ে হাতজোড় রেখেই সে নজিবুল্লাহকে বলে, স্যার, আমার একটা আর্জি আছে আপনার কাছে, আপনি না করতে পারবেন না।

জোর করে এই ভয়টা আর কুড়াবেন না। ওরা আপনাকে অপছন্দ করে আপনি প্রশ্ন করতে দেন না বলে। আমার আর্জি, ওরা যদি কোনো প্রশ্ন করে— স্যার, প্লিজ, চেষ্টা করবেন শুনতে। আমি বান্টিদের বলেছি, একটা প্রশ্ন মেরে ফেলা মানে ভবিষ্যতের একজন চিন্তাশীল মানুষকে ধ্বংস করে দেওয়া, এটা আমি মন থেকে বিশ্বাস করি বলেই বলেছি। আপনি এটা করবেন না স্যার। আমি জানি, আপনি ওদের ভালো রেজাল্ট নিয়ে খুব চিন্তা করেন। আপনি যদি ওদের কৌতূহলটাকে জাগিয়ে রাখেন, ওরা অনেক বড় মানুষ হবে, স্যার। আপনি তো এটাই চান, না?

এ কথাগুলো বিতর্কের সুরে বললে নজিবুল্লাহ স্যার হয়তো স্রেফ উড়িয়েই দিতেন ধমক দিয়ে, কিন্তু সময়ের আর পরিবেশের একটা বিরাট ক্ষমতা আছে, মানুষের মনোজগৎকে প্রভাবিত করার। এই মুহূর্তে নজিবুল্লাহ সাহেবের মনে হয়, তূর্য ঠিকই বলেছে। এই ভয় কুড়ানোর কোনো মানে হয় না!

বিদায় নেওয়ার সময় তূর্যকে জড়িয়ে ধরেন তিনি— বাবারে, তোর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখলাম আমি আজ। তুই ভালো থাকিস, কখনো কিছু লাগলে জানাস।

৯.২

এরপর থেকে নজিবুল্লাহ মাস্টার আর কোনো দিন কাউকে প্রশ্ন করার সময় থামাননি। চেষ্টা করেছেন যথাসাধ্য উত্তর দেওয়ার, ওদের আগ্রহটা জাগিয়ে রাখার। দুই বছর পরে যখন জেলার সেরা শিক্ষকের পুরস্কার ঘোষণা করা হলো, তার নামটা দেখে অবাক হয়নি কেউ। ছাত্রছাত্রীরা তাকে নিয়ে মিছিল বের করতে চেয়েছিল, তিনি কষ্টে থামিয়েছেন ওদের পাগলামি। টিনা, তন্বী তখন কলেজে। ওরাও খুব খুশি হয়েছিল, স্যারের সংবাদ পেয়ে। স্যারের অমন বদলে যাওয়ায় ওদেরও কোথায় যেন একটা ভূমিকা আছে। ওদের মনে পড়ে অঙ্ক ভাইয়ার কথা। ভাইয়ার আম্মা পরের বছর চাকরির প্রমোশন পেয়ে চলে যান অন্য একটা শহরের নামকরা কলেজে।

অঙ্ক ভাইয়ার অনেক বন্ধু এই শহরে, তাই ভাইয়া মাঝে দুইবার এসেছিলেন অল্প কয়েক দিনের জন্য। ওদের সাথে দেখা করেছেন প্রতিবারই। অনেক গল্প করেছেন ওদের সাথে। শেষবার যখন ওদের দেখা হয় টিনা জানতে চেয়েছিল, ভাইয়া, আপনি আসল অঙ্ক ছাড়াও তো অনেক কিছু জানেন। কোথেকে কী এল, কার নাম কীভাবে হলো— এগুলো কেন মনে রাখেন? এসব জেনে লাভ কী? গণিতকে কি অনেক ভালোবাসেন? উত্তরে ভাইয়া যা বলেছিল সেটা ওদের সব সময় মনে থাকবে—

এই প্রশ্নটার মুখোমুখি আমাকে প্রায়ই হতে হয়। এই যে এসব নামটাম কোথেকে এল, কে নাম দিল—এই সব জেনে লাভটা কী? তার চেয়ে শুধু এগুলো কীভাবে কাজ করে এইটা জানলেই কি হয় না? নাহ! চোখের দেখা দেখেই লাভ-ক্ষতির হিসাবটা আসলে করে ফেলা যায় না। যা কিছু শুধুই যুক্তির, শুধুই প্রয়োজনের, তা দিয়ে ভালোবাসা ব্যাপারটাকে বোঝা যায় না! যে মানুষটা শুধুই তার প্রয়োজনের সময় তোমাকে স্মরণ করে, সে তোমাকে ভালোবাসে কি না তুমি বুঝবে না!

ধরো তোমার পাশের বন্ধুটার সাথে তোমার এমন সম্পর্ক, তুই আমাকে এই নোটটা দিবি, আমি তোকে ওইটা দেব। এমন প্রয়োজনের সম্পর্ক থেকে তোমাদের বন্ধুত্ব কতখানি তীব্র, এটা বোঝা যাবে না। কিন্তু ধরো, একদিন বন্ধুটা চুপচাপ বসে আছে, তুমি পাশে গিয়ে শান্ত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলে, তোর কি মন খারাপ? এই অপ্রয়োজনীয় কথাটুকুর মধ্যে অনেক বেশি গভীরতা আছে, ভালোবাসা আছে! এবং তুমি প্রায়ই দেখবে একটা তুচ্ছ অপ্রয়োজনীয় কথা কিংবা কাজ থেকে তৈরি হওয়া বন্ধুত্বটুকু, ভালোবাসাটুকু সারা জীবনে তোমাকে যা কিছু দেবে, হাজার হাজার প্রয়োজনীয় কথাও সেটা পারবে না! জ্ঞানের ব্যাপারটাও ঠিক তাই। গণিতের একটা ছোট্ট অপ্রয়োজনীয় গল্প তোমার মধ্যে যদি ভালোবাসার একটা একটা ছোট্ট বীজ বুনে দেয়, সে যে একদিন মহিরুহ হয়ে উঠবে না, কে বলতে পারে! আমরা মানুষ— যুক্তি দিয়ে যা বুঝি তাকে যখন আবেগ দিয়ে অনুভব করি, সেই জ্ঞানটা আমাদের অনেক বেশি মানসিক শক্তি জোগায়, এগিয়ে নিয়ে যায় আরও অনেক অনেক দূর!

পরিশিষ্ট ১

হাতে-কলমে ঘনমূল নির্ণয় : বর্গমূলের নিয়মটা কেন কাজ করে তার ব্যাখ্যা এবং সেখান থেকে ঘনমূল বা n-তম মূল বের করার পদ্ধতি তৈরি

এই লেখাটা আসলে অন্যদের জন্য যতখানি লেখা, তার থেকে বেশি নিজের জন্য— প্রায়ই ভুলে যাই কিনা! আমাদের সপ্তম শ্রেণির বইয়ে হাতে-কলমে বর্গমূল বের করার একটা নিয়ম দেওয়া ছিল। সেখান থেকে বর্গমূল বের করতে পারতাম, কিন্তু সত্যিকার অর্থে বুঝতাম না নিয়মটা কেন কাজ করে। এরপর ক্লাস নাইন-টেনে থাকতে ব্যাপারটা নিয়ে আবার আগ্রহ জন্মাল এবং ইচ্ছে হলো চেষ্টা করে দেখি— ঘনমূল বের করার কোনো নিয়ম বের করতে পারি কি না। চেষ্টায় হয়তো কোনো ত্রুটি ছিল, তাই তখন পারিনি। পরে বুয়েটে দ্বিতীয় বর্ষে থাকতে আবার যখন ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলাম, তখন বিষয়টা বেশ সহজ মনে হলো। ব্যাপারগুলো নিজে নিজে বের করেছিলাম, কিন্তু কোনোভাবেই দাবি করছি না যে এটা আমার আবিষ্কার। এখন ইন্টারনেটে 'manually find cube root' লিখে গুগল করলেই এই পদ্ধতির অনেক নজির পাওয়া যায়। তখন অনেক সময় নিয়ে বের করেছিলাম।

যাহোক, আমি এখানে চেষ্টা করব, যেকোনো ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার বর্গমূল কীভাবে করতে হয়, সেই নিয়মটা শুরুতে বোঝাতে এবং তারপর সেখান থেকে ঘনমূলের নিয়ম বের করতে। এরপর আগ্রহীরা যেন n-তম মূল বের করতে পারে, তার কিছুটা নির্দেশনা দেওয়া হবে।

বর্গমূলের নিয়ম এবং এর পেছনের ঘটনা

এককথায় আসল ব্যাপার হলো $(10a+b)^2=100a^2+20ab+b^2$

একাধিক অঙ্কবিশিষ্ট যেকোনো ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যাকে $(10a+b)$ আকারে লেখা যায়। যেমন ২৩-কে লেখা যায় ১০×২+৩। আবার ১১৩-কে লেখা যায় ১০×১১+৩। এটা মাথায় রেখে আমরা বর্গমূলের নিয়মটাতে মনোযোগ দিই।

ধরা যাক ১৬৯ সংখ্যাটার আমরা বর্গমূল বের করতে চাই।

১। প্রথমে ডান দিক থেকে শুরু করে দুটো দুটো করে ঘর নিয়ে গ্রুপ বানাই। প্রতিটা গ্রুপের ওপরে একটা দাগ দিয়ে চিহ্নিত করি। ৬৯ একটা গ্রুপ আর ১ একটা গ্রুপ। (দুটো বানানোর জন্য এটাকে ০১ ও ভাবতে পারো)। খেয়াল করো, গ্রুপটা শেষ থেকে শুরু করছি। ১৬ আর ৯, এমন করে গ্রুপ বানালে হবে না কিন্তু! ভাগ করার সময় যেমন একটা দাগ দেওয়া হয়, ডান দিকে অমন একটা দাগ দিলাম। দাগের ডান পাশে ভাগের বেলায় যেখানে ভাগফল থাকত, সেখানে এখন আমরা আমাদের বর্গমূল রাখব, ওই জায়গাটাকে এখন বলব আমাদের বর্গমূলের জায়গা (ঘনমূলের ক্ষেত্রে বলব ঘনমূলের জায়গা)।

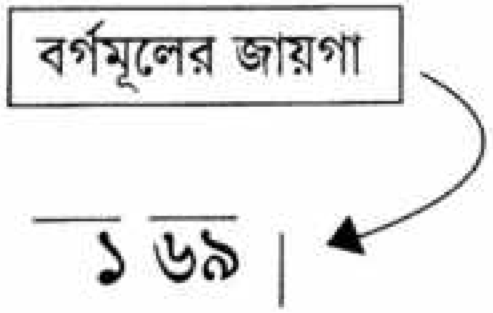

২। প্রথম গ্রুপে তাকাও— দেখো এর ভেতরে সর্বোচ্চ কোন সংখ্যার বর্গ যায়। ডান দিকে বর্গমূলের জায়গাটায় আমরা ওই সংখ্যাটা লিখব আর গ্রুপের তলায় সংখ্যাটার বর্গ লিখব। এখানে যেমন ১-এর ভেতরে ১-এর বর্গই যায়। ভাগের মতোই ওপরের সংখ্যাটা থেকে নিচের সংখ্যাটা বিয়োগ করে একটা দাগ দিয়ে নিচে বিয়োগফল লিখব। এরপাশে পরের গ্রুপটা নামাব। যেমন এখানে ১ থেকে ১ বাদ দিলে শূন্য হয়, সেটা আর লিখিনি আমি। এরপর পাশের গ্রুপ ৬৯ নামিয়েছি।

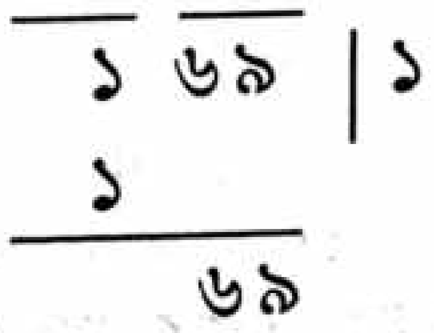

৩। বিয়োগফলের বাম দিকে ভাগের মতো একটা দাগ দিই। সেখানে বর্গমূলের জায়গায় যা আছে সেটার দ্বিগুণ লিখব এবং তার পাশে একঘর ফাঁকা জায়গা রাখব। এখানে বর্গমূলের জায়গায় ছিল ১। তাই আমি এর দ্বিগুণ ২ লিখেছি। ২-এর পাশে বাক্সের মতো একটা জায়গা রেখেছি।

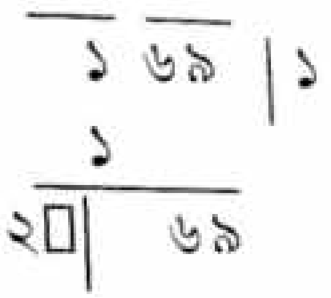

৪। এবার সবচেয়ে চিন্তার অংশ। ওই ফাঁকা জায়গায় এমন একটা অঙ্ক বসাতে হবে যেন তাকে দিয়ে পুরো সংখ্যাটা গুণ করলে সেটা ওই বিয়োগফল মানে এখানে ৬৯-এর ভেতরে যায়। একটা উদাহরণ দিলে ভালো করে বোঝা যাবে।

প্রথমে ভাবি ফাঁকা ঘরে ১ বসাব। তাহলে ২-এর পাশে ১ বসালে পাব ২১, এটাকে আবার ১ দিয়েই গুণ দিতে হবে। পাব ২১×১=২১, এটা ৬৯-এর চেয়ে ছোট। কিন্তু ১-এর চেয়ে বড় কিছু কি আর ৬৯-এর ভেতরে যায় না? দেখা যাক! ফাঁকা ঘরে ১, ২, এবং ৩ নিলে কী হবে সেটা আমি নিচের সারণিতে দেখাচ্ছি।

ফাঁকা ঘরে ১	ফাঁকা ঘরে ২	ফাঁকা ঘরে ৩
২১ ×১ ২১	২২ ×২ ৪৪	২৩ ×৩ ৬৯

বাহ, ফাঁকা ঘরে ৩ বসালে ৬৯ হয়ে যাচ্ছে, মিলে যাচ্ছে আমাদের বিয়োগফলের সাথে।

তার মানে ওই ফাঁকা ঘরে ৩ বসবে। এই ৩-কে বর্গমূলের জায়গাটায় ১-এর পাশে বসিয়ে দাও, পেয়ে যাবে পুরো সংখ্যাটার বর্গমূল। তার মানে ১৩ হচ্ছে আমাদের বর্গমূল। পাশের ছবিতে পুরো প্রক্রিয়া দেখে নাও।

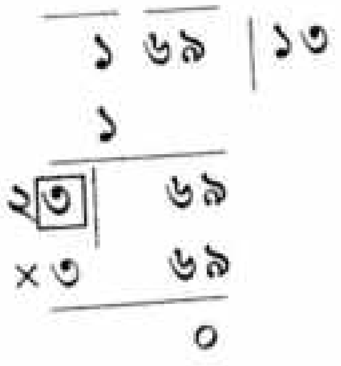

আসল ঘটনাটা কী

ঘটনা আসলে কী সেটা বোঝার জন্য আমি নিচের সারণিতে দুইটা জিনিস দেখাচ্ছি: কেবল যে বর্গমূল করলাম, সেটা আর সেটার বীজগাণিতিক রূপ।

সংখ্যা রূপ	বীজগাণিতিক রূপ
$\overline{১}\ \overline{৬৯} \mid ১৩$ ১ ২$\boxed{৩}$ $\mid$ ৬৯ ×৩ $\mid$ ৬৯ ০	$\overline{100a^2} + \overline{20ab+b^2} \mid 10a+b$ $100a^2$ $10\times2a+\boxed{b} \mid 20ab+b^2$ $\times b \mid 20ab+b^2$ 0

বীজগাণিতিক রূপটা বোঝা মোটেই কঠিন নয়। আগেই বলেছিলাম আমাদের মূল সূত্র হলো $(10a+b)^2=100a^2+20ab+b^2$। খেয়াল করো, আমাদের উদাহরণে $a=1$ আর $b=3$। এবারে $10 \times 2a+b$ রাশিটার $2a$-এর দিকে তাকালে বোঝা যায় কেন বর্গমূলের জায়গায় যা আছে তার দ্বিগুণ নিতে হয়। 10 গুণ থাকার কারণে পাশে একটা জায়গা রাখি। এরপর এমন একটা b বের করতে হয়, যেন $(10\times2a + b) \times b = 20ab+b^2$ পাওয়া যায়। আর আমরা যে দুই ঘর দুই ঘর করে গ্রুপ করেছিলাম, সেটা দেখা যায় $100a^2$ রাশিটার দিকে তাকালে। 100 গুণ থাকার কারণে সেখানে দুইটা শূন্য থাকবেই, মানে এরপর দুইটা ঘর আসবেই।

একটা ব্যাপার, এখানে বর্গমূল ছিল ১৩, দুই অঙ্কবিশিষ্ট। তাই a, b বোঝাটা সহজ। কিন্তু যদি তার থেকে বেশি অঙ্কবিশিষ্ট হয়? ধরা যাক বর্গমূল ৫২১, যেটা তিন অঙ্কবিশিষ্ট, মানে মূল সংখ্যাটা হলো ২৭১৪৪১। তখন a, b কী হবে? তখন ৫২১-কে আমরা ১০×৫২+১ আকারে ভাবতে পারব। মানে, a = ৫২, b = ১ ভাবা যাবে।

এই ছবিতে দেখলে ধারণা করতে পারবে। শুরুতে ২৭১৪-এর জন্য চিন্তা করেছি। সেখানে, a=৫ আর b=২ ধরেছি। ফলে ৫×২=১০ রেখেছি বামপাশে। এরপর ফাঁকা ঘরে ২ নিয়ে ১০২×২=২০৪ পেয়েছি, বিয়োগফল থেকেছে ১০। খেয়াল করো, যদি এই ১০ অবশিষ্ট না থাকত, সংখ্যাটা যদি ২৭১৪ না হয়ে ২৭০৪ হতো, আমরা আসলে ৫২-এর বর্গ পেতাম। কিন্তু আমাদের রয়ে গেছে ১০, এরপর পরের গ্রুপ ৪১-কে নামিয়েছি। এবারে আমাদের ভাবতে হয়েছে a=৫২ আর b=১; তখন বাম দিকে নিয়েছি ৫২-এর দ্বিগুণ ১০৪, তারপর ফাঁকা ঘরে ১ নিলেই মিলে গেছে ১০৪১×১=১০৪১ হয়ে।

$\overline{২৭}\ \overline{১৪}\ \overline{৪১} \mid ৫২১$
২৫
১০$\boxed{২}$ $\mid$ ২ ১৪
×২ $\mid$ ২ ০৪
১০৪$\boxed{১}$ $\mid$ ১০৪১
×১ $\mid$ ১০৪১
০

এ ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার বোঝা যাবে যদি সরাসরি ৫২-এর বর্গ নিয়ে ভাবা যায়। সে ক্ষেত্রে, a=৫২, a^2=২৭০৪, 2ab=১০৪, b^2=১

ঘনমূলের নিয়ম

আমরা অতীত থেকে শিক্ষা নিতে চাই। বর্গমূলে যেহেতু $(10a+b)^2$ নিয়ে ভেবেছি ঘনমূলে আমাদের ভাবতে হবে $(10a+b)^3$ নিয়ে। আমাদের ভালো করে লক্ষ করতে হবে এ রাশিটার দিকে $(10a+b)^3=1000a^3+300a^2b+30ab^2+b^3$

হাতে-কলমে ঘনমূল নির্ণয়

এখান থেকে আমরা বোঝার চেষ্টা করব, ঘনমূল নির্ণয়ের বীজগাণিতিক রূপটা

ঘনমূলের বীজগাণিতিক রূপ
$\overline{1000a^3} + \overline{300a^2b+30ab^2+b^3} \mid 10a+b$ $1000a^3$ $100\times3a^2+10\times3ab+b^2 \mid 300a^2b+30ab^2+b^3$ $\times b \mid 300a^2b+30ab^2+b^3$ 0

ভালো করে খেয়াল করো বর্গমূলের নিয়মের সাথে পার্থক্যগুলো। $1000a^3$ থেকে বলা যায় এবারে আমাদের গ্রুপ বানাতে হবে তিনটি তিনটি করে। প্রথম গ্রুপের ভেতরে কোন সংখ্যার ঘন যায়, সেটা

দেখতে হবে, তারপর বিয়োগফল নিয়ে পরের গ্রুপটা নামাতে হবে। এরপরেই হলো আসল ঘটনা। আগে বর্গমূলের জায়গাটায় যা ছিল, শুধু সেটার দ্বিগুণ নিয়েছিলাম, তারপর একটা ফাঁকা ঘর রেখেছিলাম। এ ক্ষেত্রে ঘনমূলের জায়গাটায় যে আছে তার বর্গের তিন গুণ নিতে হবে ($3a^2$)। তারপর 'দুই' ঘর ফাঁকা রাখতে হবে, যেহেতু $3a^2$-এর সাথে ১০০ গুণ আছে। 3ab-এর সাথে ১০ গুণ আছে, তাই সেটা থাকবে দশকের ঘরে। আর এককের ঘরে থাকবে b^2। কিন্তু সেই bটা কত হবে? এমন একটা এক অঙ্কের সংখ্যা b খুঁজে বের করতে হবে, যেন মাঝের ঘরে 3ab আর শেষের ঘরে b^2 রাখলে, পুরো যে সংখ্যাটা পাওয়া যাবে, তার সাথে b দিয়ে গুণ দিলে বিয়োগফলের ভেতরে যায়। আমি জানি, শুধু লেখাটা পড়ে এটা মোটেই বোঝা যাচ্ছে না।

একটা উদাহরণ দিয়ে দেখালে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে আশা করি। উদাহরণ বোঝা হয়ে গেলে ওপরের লেখাটা আরেকবার পড়ো। তখন বোঝাটা সহজ হবে।

উদাহরণ : ১২১৬৭ সংখ্যাটির ঘনমূল কত?

১। ডান থেকে শুরু করে তিনটি তিনটি করে ঘর নিয়ে গ্রুপ বানাই। প্রতিটা গ্রুপের ওপরে একটা দাগ দিয়ে চিহ্নিত করি।

$$\begin{array}{l} \overline{\text{১২}}\ \overline{\text{১৬৭}}\,|\,\text{২} \\ \ \text{৮} \\ \hline \ \text{৪}\ \text{১৬৭} \end{array}$$

২। প্রথম গ্রুপে দেখি এর ভেতরে সর্বোচ্চ কোন সংখ্যার ঘন যায়। এখানে ১২-এর মধ্যে যায় ২^৩=৮। ঘনমূলের জায়গায় ২ লিখলাম। ১২-এর তলায় লিখলাম ২-এর ঘন ৮ বিয়োগ দিলে হয় ৪। এরপর পাশের গ্রুপ ১৬৭ নামালাম।

$$\begin{array}{ll} & \overline{\text{১২}}\ \overline{\text{১৬৭}}\,|\,\text{২} \\ & \ \text{৮} \\ \hline \text{১২}\square\square & |\,\text{৪}\ \text{১৬৭} \end{array}$$

৩। বিয়োগফলের বাম দিকে ভাগের মতো একটা দাগ দিলাম। সেখানে ঘনমূলের জায়গায় যা আছে সেটার 'বর্গের তিন গুণ' ($3a^2$) লিখি এবং তার পাশে দুই ঘর ফাঁকা জায়গা রাখি। এখানে ঘনমূলের জায়গায় ছিল ২। এটার বর্গ ৪, তার তিন গুণ হলো ১২। তাই ১২ লিখেছি এবং দুটো বাক্স দিয়ে দুটো জায়গা রেখেছি।

৪। এবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ (এবং ঝামেলার) অংশ। ওই ফাঁকা জায়গা দুটোয় কী বসবে সেটা বের করতে হবে। এমন একটা অঙ্ক b বের করতে হবে, যেন মাঝের ঘরে 3ab আর শেষের ঘরে b^2 রাখলে, পুরো যে সংখ্যাটা পাওয়া যাবে, তার সাথে b দিয়ে গুণ দিলে বিয়োগফলের ভেতরে যায়। উদাহরণ দিলে ভালো করে বোঝা যাবে। আমি b-এর মান ১, ২ আর ৩ হলে কীভাবে ফাঁকা ঘরগুলোতে হিসাব করতে হবে সেটা দেখাচ্ছি। খেয়াল রেখো এখানে a=২ (ঘনমূলের জায়গায় যেটি রয়েছে)—

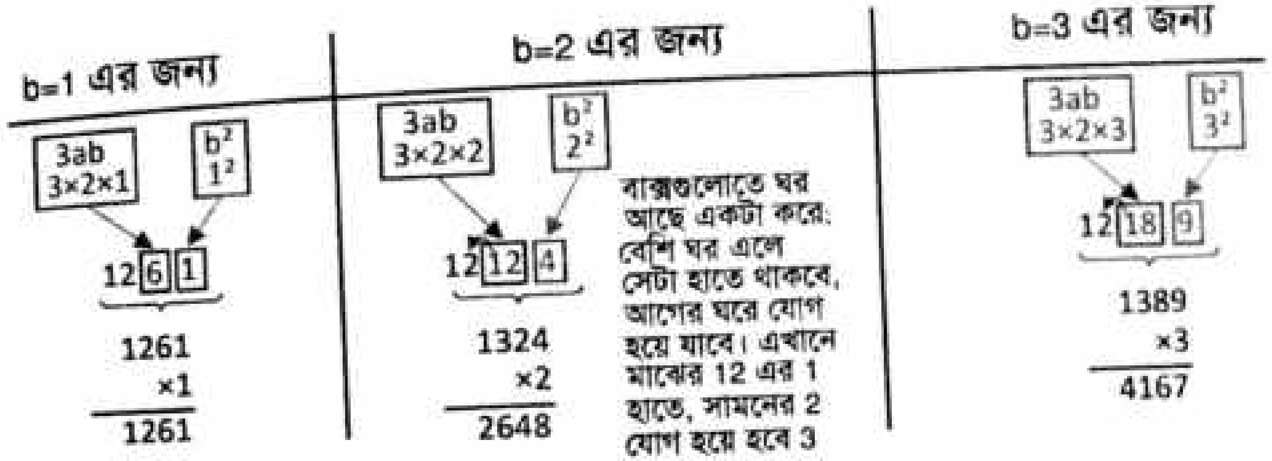
b=1 এর জন্য
3ab
3×2×1
b²
1²
12 6 1
1261
×1
1261
b=2 এর জন্য
3ab
3×2×2
b²
2²
12 12 4
1324
×2
2648
বাক্সগুলোতে ঘর আছে একটা করে: বেশি ঘর এলে সেটা হাতে থাকবে, আগের ঘরে যোগ হয়ে যাবে। এখানে মাঝের 12 এর 1 হাতে, সামনের 2 যোগ হয়ে হবে 3
b=3 এর জন্য
3ab
3×2×3
b²
3²
12 18 9
1389
×3
4167

বাহ, আমরা দেখতে পাচ্ছি ৩-এর জন্য মানটা মিলে যাচ্ছে ৪১৬৭-এর সাথে। আমরা যদি ৩-কে ঘনমূলের জায়গাটায় ২-এর পাশে বসিয়ে দিই, পেয়ে যাব পুরো সংখ্যাটার ঘনমূল। যেমন এখানে ২৩ হচ্ছে আমাদের ঘনমূল। পুরো প্রক্রিয়াটা সংক্ষেপে নিচের ছবিতে দেখা যাবে।

$3a^2=3\times2^2=12$
$3ab=3\times2\times3=18$
$b^2=3^2=9$

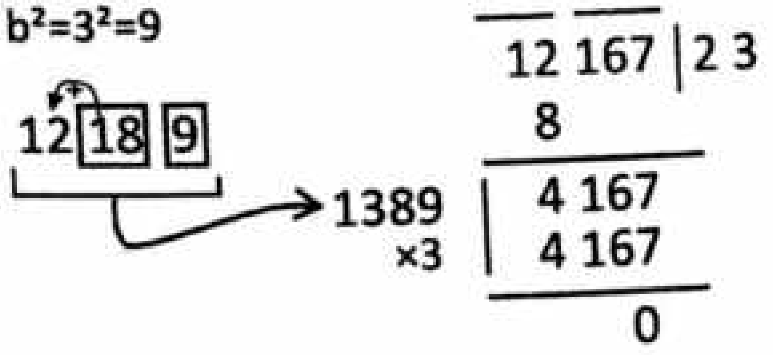
12 18 9
1389
×3
12 167 | 2 3
8
4 167
4 167
0

খেয়াল করো, 3ab=১৮-এর ৮ বাক্সে বসবে আর ১ হাতে থাকবে। সেটা সামনের ১২-এর সাথে মিলে ১৩ হবে। যদি এককের ঘরেও দুই অঙ্কবিশিষ্ট কোনো সংখ্যা আসত, সেখানেও একই কাজ করতে

হতো। যেমন b=৪ হলেই চলে আসত ১৬। তখন ৬-কে এককের ঘরে রেখে হাতের ১-কে আগের ঘরে মানে দশকের ঘরে যোগ করে পাঠিয়ে দিতাম।

আরেকটা ব্যাপার এখানে বলা উচিত।

১২ ১৬৭২
৮
১২□□|৪ ১৬৭

আমাদের কি প্রতিবার b-এর মান ১ থেকে শুরু করে মিলিয়ে যেতে হবে? যতক্ষণ না মেলে? উত্তর হলো— না! একটু বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করলেই হবে। খেয়াল করো, ঘনমূলের জায়গায় ২ লেখার পরে আমরা নিচে বাম দিকে লিখেছিলাম ১২, তারপর দুটো ঘর ফাঁকা রেখেছিলাম। তার মানে সেটা ছিল ১২০০। আর আমাদের বিয়োগফল ছিল ৪১৬৭, আপাতত ৪১০০ চিন্তা করো। শূন্য দুটো (০০) বাদ দিয়েই ভাবতে পারো। ১২-এর সাথে কত গুণ দিলে ৪১-এর কাছাকাছি একটু কম মান পাওয়া যাবে? ১২×২=২৪, ১২×৩=৩৬, ১২×৪=৪৮, তার মানে ৪ হলে বেশি হয়ে যাবে। ৩ হতে পারে। এ জন্য b-এর মান সরাসরি ৩ দিয়েই চেষ্টা শুরু করতে পারো। সব হিসাবের পর শেষ গুণফলটা যদি বিয়োগফলের চেয়ে বেশি হয়ে যেত তাহলে ৩-এর আগের সংখ্যা মানে ২ দিয়ে চেষ্টা করতাম।

নিয়ম এটুকুই। তবে আরও কয়েকটা উদাহরণ আমি করে দেখিয়ে দিচ্ছি। তাহলে যারা এখনো দ্বিধায় আছে, তাদের উপকার হবে।

উদাহরণ ১ : ৭৪০৮৮-এর ঘনমূল নির্ণয় করো

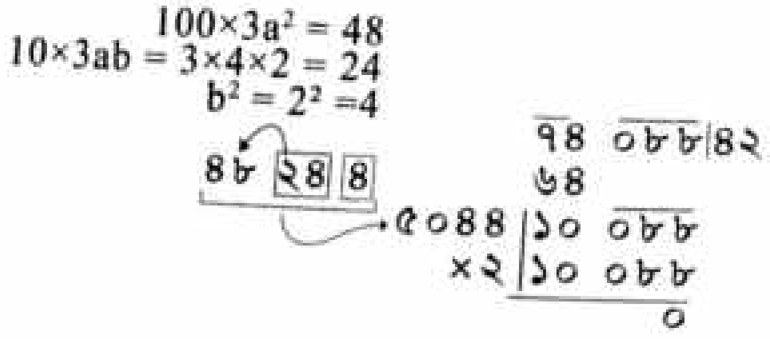
100×3a² = 48
10×3ab = 3×4×2 = 24
b² = 2² =4
৪৮ ২৪ ৪
৭৪ ০৮৮|৪২
৬৪
৫০৪৪ |১০ ০৮৮
×২ |১০ ০৮৮
০

উদাহরণ ২ : ১৯০৬৬২৪-এর ঘনমূল নির্ণয় করো

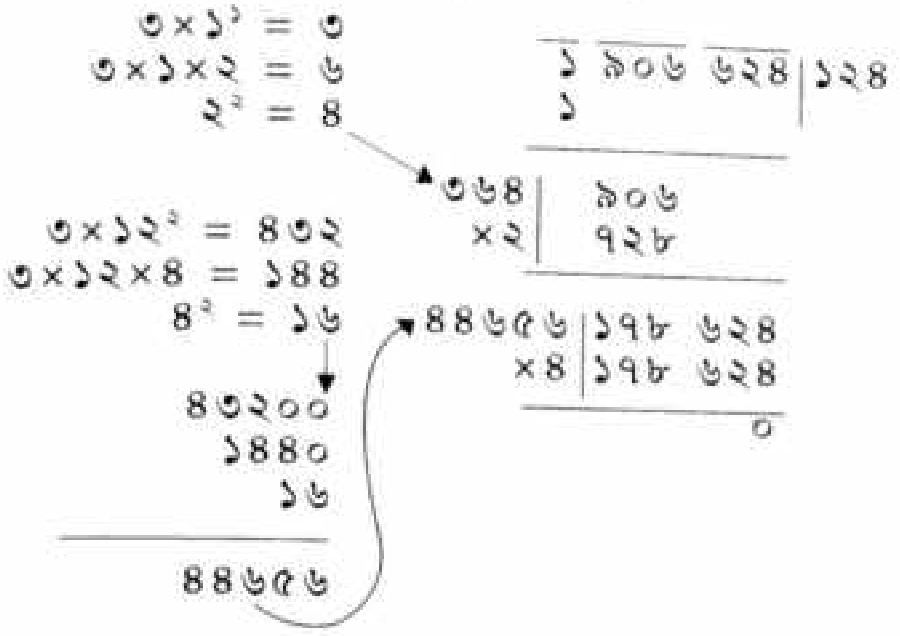
৩×১² = ৩
৩×১×২ = ৬
২² = ৪
১ ৯০৬ ৬২৪|১২৪
১
৩৬৪ | ৯০৬
×২ | ৭২৮
৩×১২² = ৪৩২
৩×১২×৪ = ১৪৪
৪² = ১৬
৪৪৬৫৬ |১৭৮ ৬২৪
×৪ |১৭৮ ৬২৪
০
৪৩২০০
১৪৪০
১৬
৪৪৬৫৬

উদাহরণ ৩ : ১৯০৬.৬২৪-এর ঘনমূল নির্ণয় করো

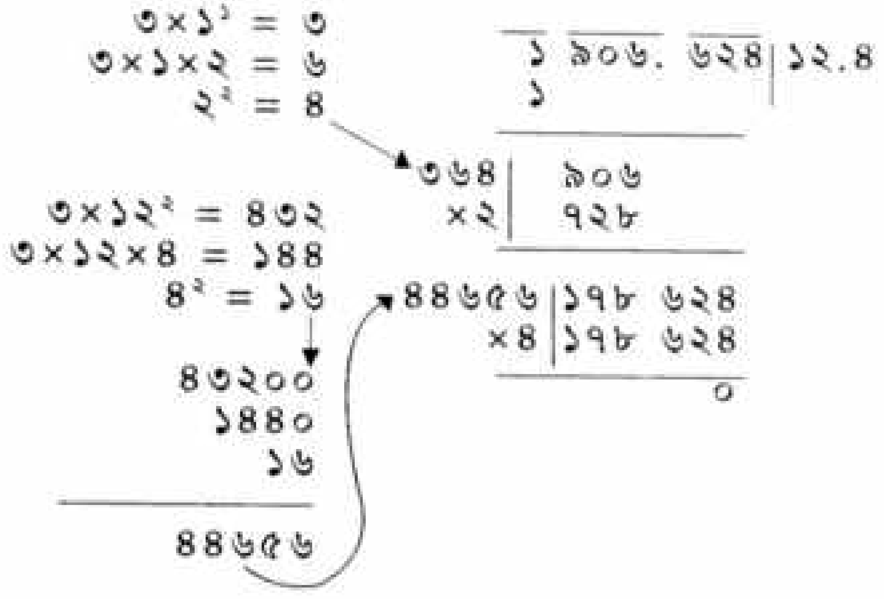
৩×১² = ৩
৩×১×২ = ৬
২² = ৪
১ ৯০৬. ৬২৪|১২.৪
১
৩৬৪ | ৯০৬
×২ | ৭২৮
৩×১২² = ৪৩২
৩×১২×৪ = ১৪৪
৪² = ১৬
৪৪৬৫৬ |১৭৮ ৬২৪
×৪ |১৭৮ ৬২৪
০
৪৩২০০
১৪৪০
১৬
৪৪৬৫৬

দশমিক থাকলে, দুটো ব্যাপার অতিরিক্ত ভাবতে হবে : গ্রুপ কীভাবে করতে হবে আর দশমিক কোথায় বসবে। গ্রুপের জন্য দশমিকের আগের আর পরের অংশ আলাদা করে ভাবতে হবে। দশমিকের আগের অঙ্কগুলো ওপরের আর সব সংখ্যার মতোই শেষ থেকে তিনটি

[illegible] থেকে শুরু করে ডান দিকে তিনটি তিনটি করে গ্রুপ করে যেতে হবে, প্রয়োজনে শূন্য দিয়ে পূরণ করতে হবে। যেমন ১২৩৪৫.৬-কে গ্রুপ গ্রুপ করে লিখলে হবে ০১২ ৩৪৫. ৬০০। আর দশমিক কোথায় বসবে সেটা সাধারণ ভাগ অঙ্কের মতোই। যখনই ওপর থেকে দশমিকের পরের কোনো গ্রুপ নামবে, ঘনমূলের জায়গায় একটা দশমিক বসবে। নিচে দেখো, যেই না ৬২৪ নেমেছে, ওপরে ১২-এর পর একটা দশমিক বসিয়ে দিয়েছি। দশমিকসহ একটা উদাহরণ দেখাচ্ছি এখানে। (এটা আসলে আগের উদাহরণটাই, মাঝে শুধু একটা দশমিক বসিয়ে দিয়েছি)।

শেষ কথা : যারা ধৈর্য নিয়ে এ পর্যন্ত আসতে পেরেছ, অভিনন্দন। যদি সত্যিই বুঝে থাকো, তাহলে শুধু ঘনমূল না, n-তম মূল কীভাবে বের করতে হবে সেটারও একটা ধারণা পাওয়ার কথা তোমার (এখানে n হলো ১-এর চেয়ে বড় পূর্ণসংখ্যা)। চতুর্থমূলের জন্য যেই সম্পর্কটা ব্যবহার করতে হবে সেটা বলে দিই—

$$(10a+b)^4 = 10000a^4 + 4000a^3b + 600a^2b^2 + 40ab^3 + b^4$$

এখান থেকে ১০৪৮৫৭৬ সংখ্যাটার চতুর্থমূল কি বের করে দেখাতে পারবে? যদি পারো, তাহলে বুঝব তুমি আসলেই পুরো প্রক্রিয়াটা বুঝেছ। সে ক্ষেত্রে পুরো হিসাবের ছবি তুলে আমাকে ইমেইলে পাঠিয়ে দিয়ো। আমি জানাব হয়েছে কি না! অনেকে দুবার বর্গমূল করেও চতুর্থমূল বের করে ফেলার চিন্তা করতে পারে, আমি সেটা চাচ্ছি না। আমি চাই এই বিস্তৃতি ব্যবহার করেই তোমরা বের করো। আর হ্যাঁ, শুধু উত্তর লিখে দিয়ো না, শুধু উত্তর দিলে বুঝব ক্যালকুলেটর চেপে বের করে ফেলেছ। চতুর্থমূল বের করতে যদি বেশি কষ্ট হয়, তাহলে নিজেরা ৬৮৯২১, ১৯৪৬৫১০৯ এদের ঘনমূল বের করো। তাহলেও ধারণাটা পাকাপোক্ত হবে।

বিষয়-তালিকা

১. শুধু কী কাজে লাগে বলেই গণিত সুন্দর? ১৭
২. 11=Onety one, 12=Onety two নয় কেন? ২৪
৩. 1th, 2th, 3th হলো না কেন? ২৬
৪. সাড়ে এক, সাড়ে দুই নাকি দেড়, আড়াই? ২৬
৫. পৃথিবীতে অঙ্ক কয়টা? ২৭
৬. ০ আবিষ্কারের আগে ১০, ২০ লিখত কীভাবে? ২৮
৭. বাংলাদেশের আয়তন নাকি ক্ষেত্রফল ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিমি? ২৮
৮. বাংলাদেশের আয়তন কত ঘনকিমি? ৩০
৯. বর্গপুকুর ধাঁধা ৩৩
১০. সংখ্যার শুরু কোথায়? ৩৬
১১. অনেক অনেক বছর আগে জিনিসপাতির বয়স বের করত কিভাবে? ৩৬
১২. সুমার কি সুমেরুতে? ৩৮
১৩. ৬০ মিনিটে ১ ঘণ্টা, ১২ বছরে ১ যুগ। কেন ৬০, কেন ১২? কেন ২৫ বা ২৬ নয়? ৩৮
১৪. বৃত্ত কেন ৩৬০ ডিগ্রি? ৪০
১৫. শূন্য ধনাত্মক না কি ঋণাত্মক? ৪২
১৬. শূন্য জোড় না কি বিজোড়? ৪২
১৭. শূন্য দিয়ে ভাগ করলে কেন ওই সংখ্যাটাই পাওয়া যায় না? ৪৩
১৮. শূন্য দিয়ে ভাগ করার আরেক সমস্যা ৪৪

১৯. ঋণাত্মক সংখ্যার কী দরকার ছিল? ৪৫
২০. ঋণাত্মক সংখ্যার লসাগু-গসাগু কেমন হয়? ৪৬
২১. একটা সংখ্যা শূন্য থাকলে লসাগু-গসাগু কেমন হয়? ৪৮
২২. ০ আর ০-এর গসাগুর ক্ষেত্রে ঝামেলা কোথায়? ৪৯
২৩. লসাগুর মূল ঘটনাটা কী? ৫০
২৪. সহমৌলিক সংখ্যা কী? ৫২
২৫. মৌলিক সংখ্যা কী? ৫২
২৬. ১ কেন মৌলিক নয়? ৫২
২৭. ফিবোনাচি সিরিজ কোত্থেকে এল? ৫৫
২৮. ডায়োফেন্টাসের কবর ৫৭
২৯. বীজগণিত আর পাটিগণিতের নাম রহস্য ৬০
৩০. a, b, c, d না ধরে অজানা রাশি কেন x ধরে নিই? ৬০
৩১. অত বীজগণিত শিখে লাভ কী? ৬২
৩২. গণিতের একটি জাদু ও তার ব্যাখ্যা ৬৩
৩৩. গণিতের আরেক জাদু এবং তার ব্যাখ্যা ৬৪
৩৪. মনে মনে বর্গ করার উপায় ৬৫
৩৫. বর্গমূল, ঘনমূল এবং যেকোনোতম মূল বের করার উপায় ৭০
৩৬. লগ জিনিসটা আসলে কী? ৭১
৩৭. বীজগণিতের সাতটা অপারেশন কী কী? ৭২
৩৮. লগের ভেতর গুণ থাকলে বাইরে আলাদা করে যোগ হয় কেন? ৭৪
৩৯. লগের ভেতর পাওয়ার থাকলে বাইরে বেরিয়ে আসে কেন? ৭৫
৪০. লগ দিয়ে অঙ্কসংখ্যা বের করা ৭৬
৪১. লগের আরেক ব্যবহার ৭৭
৪২. লগের ভিত্তি কি ঋণাত্মক হতে পারে? ৭৭
৪৩. ক্যালকুলেটর ছাড়া কি লগের মান বের করা যায়? ৭৮
৪৪. ফাংশন দিয়ে কী হয়? ৮১
৪৫. পরমমান তুললে প্লাস-মাইনাস লিখতে হয় কেন? ৮২
৪৬. $\sqrt{4}$=কত? +2, -2 নাকি ±2 ৮৪

৪৭. √ প্রতীকটা কোত্থেকে এল? ৮৫
৪৮. $f(x)= x^2$ কি এক-এক ফাংশন? ৮৬
৪৯. কোডোমেন আর রেঞ্জের পার্থক্য কী? ৮৭
৫০. সার্বিক ফাংশন কী? ৮৮
৫১. অসীম আর শূন্য গুণ দিলে শূন্য হয় না কেন? ৮৯
৫২. লিমিট জিনিসটা কী? ৮৯
৫৩. অনির্ণেয় আকার কোনগুলো? ৯০
৫৪. অসীম কি কোনো সংখ্যা? ৯২
৫৫. অসমতার সমস্যা ৯৩
৫৬. 'বা' কখন আর 'এবং' কখন? ৯৩
৫৭. দেখতে সহজ, ভাবতে মজা সমস্যা ৯৪
৫৮. অসমতায় ব্যস্তকরণ করলে কি সব সময় অসমতার চিহ্ন উল্টে যায়? ৯৫
৫৯. চোখের ক্ষেত্রফল ৯৬
৬০. জ্যামিতির শুরু কোথায়? ৯৮
৬১. বিন্দু কী জিনিস ১০০
৬২. মোটা মার্কার, ০.৫ মিমি কলম নাকি সূক্ষ্ম পেনসিলে আঁকা বিন্দু? ১০০
৬৩. বিন্দু, রেখা, বৃত্ত কি আসলে আঁকা যায়? ১০১
৬৪. ছবি 'আঁকি' না ছবি 'লিখি'? ১০১
৬৫. x অক্ষকেই কেন স্বাধীন ধরা হয়? ১০২
৬৬. পিথাগোরাসের উপপাদ্য কী কাজে লাগে ১০৩
৬৭. নয় ভুজের ক্ষেত্রফল কীভাবে বের করা যাবে? ১০৩
৬৮. স্থানাঙ্কের দূরত্ব ১০৪
৬৯. পিথাগোরাস দিয়ে আইনস্টাইনের সূত্র ১০৪
৭০. পিথাগোরাস থেকে টুইন প্যারাডক্স ১০৫
৭১. আয়ত, বর্গ, রম্বসে মিল-অমিল ১০৬
৭২. ২২/৭ কি পাই? ২২/৭-এর আনন্দটা কী রকম? ১০৭
৭৩. পাইয়ের মান অতঘর জেনে লাভ কী? ১০৯

৭৪. কোণের ক্ষেত্রে পাইয়ের মান ১৮০ ডিগ্রি কী করে? ১১০
৭৫. রেডিয়ান কোণ কী? ১১০
৭৬. এক রেডিয়ান কোণ কি আদৌ পেনসিল-কম্পাসে আঁকা যায়? ১১১
৭৭. গ্রেডিয়ান আসলে কী? ১১২
৭৮. গোলকের আয়তন ও পেঁয়াজকুচি পদ্ধতি ১১২
৭৯. গানের সাথে গণিতের সম্পর্ক কবে থেকে জানে মানুষ? ১১৮
৮০. বিজ্ঞান কী বলে, গান আসলে কী? ১১৯
৮১. সা-রে-গা-মা-র গণিত ১২০
৮২. এ মাইনর কর্ড কী জিনিস? ১২২
৮৩. সাইন, কস নামগুলো কোত্থেকে এল? ১২৮
৮৪. ত্রিকোণমিতি কোন কাজে লাগে? ১৩৩
৮৫. সাইন আর সাইন কি কাটাকাটি যায়? ১৩৪
৮৬. sin13°, sin71° এমন যেকোনো কোণের মান কীভাবে পাওয়া যাবে? ১৩৫
৮৭. কাল্পনিক সংখ্যা কী? ১৩৬
৮৮. গণিতের সুন্দরতম সমীকরণ ১৩৭
৮৯. হাতে-কলমে ঘনমূল নির্ণয় ১৪৯

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই আমার ফেসবুক পেজের বন্ধু, ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীদের। কিছুকাল আগে (আগস্ট ১২, ২০১৭) ফেসবুকে 'কমেন্টে কমেন্টে গণিত' নামে একটি পোস্ট দেওয়ার পর সেখানে অনেক মানুষ প্রশ্ন করেছিল। অনেকের প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছি, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও অনেকের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ে ওঠেনি। এ বইটির ধারণা তখনই মাথায় আসে। এ বইটিতে একটা বিরাট অবদান তাদের, যারা প্রশ্ন দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন বইটিকে। নিচে বর্ণানুক্রমে তাদের ফেসবুক প্রোফাইল নামের তালিকা দেওয়া হলো—

খায়রুল বিন আমিন
সৈয়দ ইমতিয়াজ আহমেদ
Abu Royhan Sopno
Adib Nashid
Adrij Bachchan
Afridi Rahim
Ahamed Asief
Azmal Karim Sirat
Diganto Mojumder
Ekramul Hoque
Farhan Rabby
Fayaz Masnun Labib
Gmh Khwarezmi Al Musa
Hafizur Rahman Shakil
Imran Hasan Bayejid
Indranil Swakshar Sarkar
Ishtiaque Shilpo
Jashim Uddin
Kamrul Hasan Tuhin
Kawsar Mahmud
Khadizatul Kubra Sara
M Kawsar Hossen
Mamunur Rashid Don
Md Imtiajul Karim

Md Kamal Hossain
Md Mehedi Hasan
MD Naeem Haider
MD Sabbir Ahmed
Naima Binte Azad
Nayem Sheikh
Nazim Uddin Saimum
Neel Sagar
Nusrat Tushu
Parves Khan
PM Anawarul Iqbal
Pothik Roy
Pran Krishno Das
Rajib Hossain
Rakib Hasan Sidor
Rakibul Haydar Rakib
Rashed Khan
Rifat Vectra RX
Robinhood Chowdhury
Rokunuzzaman Tuash
Rubaiya Haque Ruba
Sabab Iqbal
Sabila Nawshin
Sadman Shuvo
Sakibul Hoque
Sakibul Munna
Sakibul Munna
Sanjida Bokul
Shahid Bin Siraz
Shahriar Rahman Siam,
Shahriyar Mohammad Siyar
Shahrukh Islam
Sheikh Monir Ahmed
Tamanna Jahan Tonni
Tania Jannat
Tanjim Azad Chowdhury
Tanzin Tisha
Tawhid Shajad

Md Kamal Hossain
Md Mehedi Hasan
MD Naeem Haider
MD Sabbir Ahmed
Naima Binte Azad
Nayem Sheikh
Nazim Uddin Saimum
Neel Sagar
Nusrat Tushu
Parves Khan
PM Anawarul Iqbal
Pothik Roy
Pran Krishno Das
Rajib Hossain
Rakib Hasan Sidor
Rakibul Haydar Rakib
Rashed Khan
Rifat Vectra RX
Robinhood Chowdhury
Rokunuzzaman Tuash
Rubaiya Haque Ruba
Sabab Iqbal
Sabila Nawshin
Sadman Shuvo
Sakibul Hoque
Sakibul Munna
Sakibul Munna
Sanjida Bokul
Shahid Bin Siraz
Shahriar Rahman Siam,
Shahriyar Mohammad Siyam
Shahrukh Islam
Sheikh Monir Ahmed
Tamanna Jahan Tonni
Tania Jannat
Tanjim Azad Chowdhury
Tanzin Tisha
Tawhid Shajad

◆

চমক হাসানের জন্ম ২৮ জুলাই, ১৯৮৬, কুষ্টিয়ায়। বাবা আহসানুল হক, মা নওরাজিস আরা জাহান। এইচএসসি পর্যন্ত লেখাপড়া কুষ্টিয়াতেই। এরপর বুয়েট থেকে তড়িৎকৌশলে স্নাতক এবং পরে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ক্যারোলাইনা থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। বর্তমানে গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত আছেন 'বোস্টন সায়েন্টিফিক করপোরেশন'-এ। স্ত্রী ফিরোজা বহ্নি এবং কন্যা বিনীতা বর্ণমালার সঙ্গে থাকেন ক্যালিফোর্নিয়ার সান্টা ক্লারিটা শহরে।

তার ভালো লাগে গাইতে, পড়তে, শিখতে, শেখাতে। চমক হাসান আশাবাদী মানুষ, স্বপ্ন দেখেন আলোকিত ভবিষ্যতের, যখন এ দেশের ছেলেমেয়েরা আনন্দ নিয়ে লেখাপড়া করবে, প্রশ্ন করতে ভয় পাবে না, মুখস্থ করে পাস করবে না। ওরা অনুভব করবে কেন, কীভাবে, কী হচ্ছে! গণিত অলিম্পিয়াড শুরুর সাথে সাথে এই আন্দোলনটাও শুরু হয়ে গেছে। তিনি সেই আন্দোলনের একজন কর্মী। গণিত অলিম্পিয়াডের একাডেমিক দলে প্রশিক্ষক, প্রশ্নপ্রণেতা ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করেছেন বেশ কিছুদিন। পাঠকের যেকোনো মন্তব্য তার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মন্তব্য জানাতে পারেন ই-মেইলে কিংবা ফেসবুকে তার অফিশিয়াল পেজে।

ই-মেইল : chondrochari@gmail.com
ফেসবুক পেজ : www.facebook.com/chamok.hasan

MATHEMATICS 2018

ADARSHA
+88-02-9612877, +88-01793296202
info@adarshapublications.com
www.adarshapublications.com